ANCHALIK SOVIET
SAHITYER ADIPARVA

প্রথম প্রকাশ—
আষাঢ় ১৩৬৭
জুলাই ১৯৬০

প্রকাশ করেছেন
শ্রীঅজিতকুমার পাল

ছেপেছেন
চরাচর প্রেস
জি টি রোড মোড়
ব্যাণ্ডেল

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

॥ সূচীপত্র ॥

॥ ভূমিকা ॥

বর্তমান গ্রন্থটি যাঁর লেখার কথা ছিল তিনি যদি তা করে যেতে সক্ষম হতেন তাহলে এই 'আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব' বাংলা গবেষণা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ হিসাবে নিঃসন্দেহে গণ্য হতে পারত। আমি পরলোকগত প্রভাত-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছি, যিনি শুধু রুশ ভাষাতেই সুদক্ষ ছিলেন না, সোভিয়েট দেশের আরও কয়েকটি ভাষা সম্পর্কে রীতিমত ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই কারণেই আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি যেন সোভিয়েট দেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে যে সাহিত্যসম্পদ বর্তমান রয়েছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়ন করেন, কেননা তিনি ছিলেন এ-বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি। আমার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হয়েছিলেন, এই উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ করার কাজে হাতও দিয়েছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিকভাবে তিনি পরলোকগমন করায় তাঁর পরিকল্পনা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি।

প্রভাতবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর কিছু কাগজপত্র আমার হাতে আসে, যেগুলির মধ্যে এই বিষয়ের উপর সংগ্রহ করা তাঁর কিছু কিছু নোট পাই, অবশ্য অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ আকারে। আমার পরম বন্ধু শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী, যিনি তখন সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আমাকে এই বিষয়ে কাজ করতে বলেন, এবং স্থির হয় যে কয়েকটি প্রবন্ধের আকারে আঞ্চলিক

সোভিয়েট সাহিত্য সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাবলী প্রকাশ করা হবে ওই পত্রিকাতেই। কিন্তু ঘটনাচক্রে ওই পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার পর এবং দিলীপবাবু সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাবার পর, এ পরিকল্পনাও বানচাল হয়ে যায়। সে যাই হোক, ইত্যবসরে বইটি রচনা করার কাজ একরকম সমাপ্ত হয়, যদিও আমার নিজের বিচারে খুব সন্তোষজনক নয়, যার একমাত্র কারণ উপকরণের অভাব। এখানে বসে এ-কাজ করা যায় না। প্রভাতবাবু রুশ সূত্র ধরে শুরু করেছিলেন, তিনি জীবিত থাকলে কি করতেন জানিনা, কিন্তু আমাকে ইংরাজী সূত্র ধরেই কাজ করতে হয়েছে, যদিও সেখান থেকে সাহায্য খুব কমই পাওয়া গেছে। ইংরাজীতে সোভিয়েট দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উপর বই যে নেই তা নয়। প্রভাতবাবুর নোটে আমি কমপক্ষে পঞ্চাশটি বই-এর উল্লেখ পেয়েছি, কিন্তু সেগুলির একটিকেও আমি কলকাতার কোন গ্রন্থাগারে পাইনি, নিরুপায় হয়ে অন্যত্র আমার যে সব বন্ধুবান্ধব আছেন তাঁদের ওই তালিকা পাঠাই, তাঁরাও ওই তালিকার কোন বই-এর হদিশ দিতে পারেন নি।

এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যেটুকু করা সম্ভব তা করতে অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করিনি। বিশ শতকের সাহিত্য আপাততঃ আলোচনার বাইরে রাখা ভিন্ন আর কোন উপায় ছিলনা, কেননা অসম্পূর্ণ আলোচনার চেয়ে তা একদম না করাই ভাল। অবশ্য আমি বর্তমানে এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করছি, কেননা পরবর্তী সংস্করণে একেবারে আধুনিক যুগ পর্যন্ত টানবার ইচ্ছা আছে। সে যাই হোক, উনিশ শতক পর্যন্ত আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের যে ইতিহাস এখানে বিবৃত হয়েছে তা যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গ হয় সে চেষ্টা করার ত্রুটি করিনি। একমাত্র ব্যতিক্রম তুর্কী সাহিত্য, উনিশ

শতক পর্যন্ত যার ইতিহাস টানতে পারিনি, সপ্তদশ শতকেই আমাকে থামতে হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে পশ্চিমী তুর্কী (আনাতোলীয়) সাহিত্যের ইতিহাসের যে ধারাবাহিকতা আছে, পূর্বী তুর্কী (আজেরি, চাঘতাই ইত্যাদি) সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা নেই। অষ্টাদশ শতকে পৌঁছেই তার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার নূতনভাবে তার জাগরণ হয়েছে সোভিয়েট যুগে। মোলডাভীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা আছে, কেননা ওই সাহিত্যেরও প্রকৃত উদ্ভব সোভিয়েট যুগ থেকে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্তির পূর্বে মোলডাভীয়ার স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তা গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু এ সবের চেয়েও, এই গ্রন্থটি রচনায় যেটি আমার কাছে সর্ববৃহৎ সমস্যা হিসাবে দাঁড়িয়েছিল তা হচ্ছে সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে আমার যোগ্যতার সমস্যা। আমি পেশাদার ঐতিহাসিক, আমার কাছে একটি গ্রন্থের আকর্ষণ তার সাহিত্যমূল্যে নয়, তার প্রাচীনত্বে। তবে ইউরোপীয় আঞ্চলিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের সুবিধা আছে। বহু ক্ষেত্রেই এগুলির উদ্ভব হয়েছে ধর্মীয় প্রয়োজনে এবং মুদ্রাযন্ত্র আবিস্কৃত হবার পর। ইউরোপের সরকারী ভাষা বরাবরই ছিল ল্যাটিন। রেনেসাঁস আন্দোলনের পর বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্থানীয় ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু হয় মূলত ধর্মশাস্ত্র সমূহ অনুবাদের মধ্য দিয়ে। নাট্যসাহিত্যেরও সূত্রপাত হয় ধর্মীয় প্রয়োজনে, বাইবেলের বিভিন্ন উপাখ্যান অবলম্বনে 'রহস্যনাটক'—সমূহের অভিনয়ের মাধ্যমে। ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের সৃষ্টি হতে একটু দেরিই হয়েছিল। এ ছাড়া ইউরোপের প্রাক্-খৃষ্টীয় প্যাগান ঐতিহ্য বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিভিন্ন দেশের প্রাক্-খৃষ্টীয় প্যাগান রূপকসমূহ (মাইথোলজি) ও বীরগাথাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য বর্তমান।

খৃষ্টধর্মের প্রচারকেরা এগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি, পুরাতন যুগের দেবদেবী ও বীরগণের সঙ্গে তাঁরা আপোস করেছিলেন, অধিকাংশকেই সেন্ট বানিয়ে দিয়ে। ইউরোপীয় সাহিত্যের আদিপর্বে সর্বত্রই এই সকল ঘটনার প্রভাব বর্তমান। বাওয়ালফ, নিবেলুঙ্গে-নলিয়েড, সাঁজ দ্য রোলাঁ প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গে রুশ ইগোর-গাথা বা আর্মেনীয় ডেভিড-গাথার কোন চরিত্রগত পার্থক্য নেই। নায়ক নায়িকা সর্বত্রই একই ধরণের এমন কি ঘটনাচক্র-গুলির মধ্যেও সাদৃশ্য প্রচুর, পার্থক্য শুধু স্থান ও কালের।

গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট হিসাবে সোভিয়েট দেশে ভারততত্ত্ব চর্চার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস যুক্ত করা হয়েছে। মূল বিষয় বস্তুব সঙ্গে যদিও খাপ খায়না, তা সত্ত্বেও বিষয়টিব প্রতি বাঙালী পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক মনে করে আমরা তা এখানে যুক্ত করেছি। সোভিয়েট দেশে ভারততত্ত্ব চর্চার ইতিবৃত্ত অধ্যাপক কালিয়ানোভের একটি রচনা থেকে গৃহীত। আমার বিশিষ্ট বন্ধু লোকায়ত-দর্শনের প্রণেতা অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভাতবাবুকে কালিয়ানোভের রচনাটি অনুবাদ করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু রচনাটির এক তৃতীয়াংশের মত অনুবাদ করার পরেই তাঁর জীবনাস্ত হয় যে কারণে পুরো অনুবাদটি না দিয়ে বচনাটির সংক্ষিপ্তসার এখানে পরিবেশন করা হয়েছে, যেটি প্রস্তুত করেছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, যিনি প্রভাতবাবুর কন্যা এবং কিছুকাল রুশ ভাষা শিক্ষা করেছিলেন।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে একজন আমাকে বরাবর উৎসাহ দিয়ে এসেছেন, যিনি হচ্ছেন আমার পরম শুভানুধ্যায়ী বিখ্যাত প্রকাশক শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া চরাচর প্রেসের পরিচালকবর্গ ও কর্মীগণকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমারই অনবধানতায় কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে যার জন্য আমি দুঃখিত।

॥ লেখক পরিচিতি ॥

প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন কর্মী হিসাবে জীবন শুরু করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলেন। ফরোয়ার্ড পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। হুগলী কোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবি হিসাবে এবং হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর যেমন একদিকে স্থানীয় খ্যাতি ছিল, অপরদিকে তুলনামূলক আইনের উপর তাঁর কয়েকটি রচনা ওই বিষয়ের বিদগ্ধ মহলেও একদা যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। ভারততত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, এবং শেষ বয়সে তিনি আঁরি পারমেন্তিয়ে কর্তৃক ফরাসী ভাষায় রচিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শিল্পতত্ত্ব সংক্রান্ত একটি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ ও ভিলিবাল্‌ড কিরফেল কর্তৃক জার্মান ভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতীয় ভূবৃত্তান্তের উপর একটি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেন, যেগুলি প্রকাশনার প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে। রুশ ভাষা থেকে তিনি একটি মাত্র গ্রন্থেরই বঙ্গানুবাদ করেছিলেন যা ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ‘মহাবিশ্বের রহস্য’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৯৩৪)

জন্ম চুঁচুড়ায়। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে ডক্টরেট ডিগ্রী ও গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং বর্তমানে ওখানেই গবেষণা ও অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন। ডঃ ভট্টাচার্যের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য Indian Puberty Rites (কলিকাতা ১৯৫৮), Indian Mother Goddess (কলিকাতা ১৯৫০), History of Indian Cosmogonical Ideas (নয়াদিল্লী ১৯৫১), 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস' (কলিকাতা ১৯৫২) প্রভৃতি। তাঁর যে গ্রন্থগুলি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে সেগুলি হচ্ছে 'বিশ্বসাহিত্যের আদিপর্ব' (পূর্বে সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত) ও History of the Sakta Religion। এ ছাড়া Vivekananda Commemoration Volume, G. M. Moraes Felicitation Volume প্রভৃতি স্মারক গ্রন্থে ভারততত্ত্বের উপর তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে এবং বরোদার Journal of the Oriental Institute ও কেরলের Journal of Indian History পত্রিকার নিয়মিত লেখকদের মধ্যে তিনি একজন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একটি প্রকল্পে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের একটি ভৌগোলিক অভিধান প্রণয়নের কাজে ব্রতী ছিলেন যা বর্তমানে প্রকাশের অপেক্ষায়। ডঃ ভট্টাচার্য বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরেই যুক্ত এবং নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন।

॥ সোভিয়েট দেশের ভাষাসমূহ ॥

॥ ১ ॥

আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে। গোড়ায় সোভিয়েট ইউনিয়ন চারটি সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত ছিল ঃ (১) রুশীয় যুক্তরাষ্ট্র, (২) ইউক্রানীয়, (৩) বাইলোরুশীয় এবং (৪) ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্র। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত করা হয় যে রুশীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুর্কীস্তান অঞ্চলটিকে পৃথক করে আনা হবে এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে এটিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক প্রজাতন্ত্র তৈরী করা হবে। এই কাজটি সম্পন্ন করতে সময় লেগেছিল বারো বছর ঃ উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, তাজিকিস্তানের সৃষ্টিকাল ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস, কাজাক ও কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রদ্বয়ের সৃষ্টি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। ওই একই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৩৬ এর ডিসেম্বরে, ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে তার স্থলে তিনটি পৃথক রিপাবলিকের সৃষ্টি করা হয়—জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান। উপরি উক্ত এগারোটি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আরও পাঁচটি প্রজাতন্ত্র সোভিয়েট ইউনিয়নে যুক্ত হয়, যেগুলির নাম যথাক্রমে কারেলিয়া, এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং মোলডাভিয়া। এগুলির সংযুক্তিকাল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ। ১৯৫৬ সালের ষোলই জুলাই

কারেলিয়া রুশীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়ে উক্ত প্রজাতন্ত্রের চতুর্দশতম স্বায়ত্ত শাসিত এলাকায় পরিণত হয়।

॥ ২ ॥

তাহলে দেখা যাচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভৌগোলিক আয়তনই শুধু বিশাল নয়, এই ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রতিটি প্রজাতন্ত্রই, কি যুক্তরাষ্ট্রীয় কি একক, বলতে গেলে ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক। এখানে সংস্কৃতি কথাটা আমরা ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করছি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে বৃহৎ-রুশ ভাষাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। বৃহৎ-রুশ শব্দটি ব্যবহার করা হয় এই ভাষাটির সঙ্গে শ্বেত-রুশ বা বাইলোরুশীয় এবং ক্ষুদ্র রুশ বা ইউক্রানীয় ভাষাদ্বয়ের পার্থক্য বোঝাবার জন্য। এই তিনটি ভাষা একত্রে পূর্ব শ্লাভীয় পরিবারের অন্তর্গত।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শ্লাভীয় বা শ্লাভনিক বংশের আরও দুটি পরিবার আছে। একটি হচ্ছে পশ্চিম শ্লাভীয় যা গড়ে উঠেছে পোল, শ্লোভাক, চেক এবং উচ্চ ও নিম্ন সোর্বীয় ভাষাগুলি নিয়ে। অপরটি হচ্ছে দক্ষিণ শ্লাভীয় যার সদস্য হচ্ছে শ্লোভেন, সার্বো-ক্রোট, ম্যাসিডোনীয়, বুলগেরীয় ও চার্চ-শ্লাভ। শ্লাভীয় বা শ্লাভনিক বংশটি বৃহত্তর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত, এবং লিথুয়ানীয়, ল্যাটভীয়, প্রাচীন প্রুশীয় প্রভৃতি বাল্টিক-বংশীয় ভাষাগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। পূর্ব ইউরোপ, বিশেষ করে পূর্ব জার্মানীর কিয়দংশ, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ অংশ শ্লাভভাষী।

বলকান অঞ্চলের 'চার্চ-শ্লাভনিক ভাষারই একটি বিবর্তিত ও সংমিশ্রিত রূপ হিসাবেই বৃহৎ রুশ ভাষার উদ্ভব হয়। বুলগেরীয় ভাষারীতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক যুক্ত এই চার্চ-শ্লাভনিকই কালক্রমে রুশিয়ার শিক্ষিত মানুষের লেখ্য ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাষাতেই গ্রীক থেকে খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র সমূহ অনূদিত হয়। দক্ষিণ শ্লাভীয় পরিবারের এই ভাষাটিকে পরিমার্জিত ও ধর্ম-শাস্ত্রসমূহের অনুবাদের উপযোগী করে তুলেছিলেন নবম শতকের দু জন ধর্মযাজক, দুই ভাই, সিরিল ও মেথোডিয়াস। এই ভাষার লিপি প্রবর্তনেরও কৃতিত্ব তাঁদের। অবশ্য গ্রীক লিপিকে অবলম্বন করেই তাঁরা এই লিপি গড়ে তোলেন (আধুনিক রুশ লিপির সঙ্গে গ্রীক লিপির পার্থক্য সামান্যই) এবং সিরিলের নামেই এই লিপির নাম হয়েছে সিরিলীয় লিপি।

সিরিলীয় লিপি নবম শতকেই পশ্চিমী ও দক্ষিণী শ্লাভীয়গণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং শীঘ্রই তা পূর্ব-শ্লাভীয়দের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। ৯১১, ৯৪৪ ও ৯৭১ খৃষ্টাব্দে কিয়েভের রাজকুমারদের সঙ্গে বাইজানটাইন রাজশক্তির যে সব সন্ধিগুলি সম্পাদিত হয়েছিল, সেইগুলির বয়ান পাওয়া যায় প্রাচীন রুশীয় ক্রনিকল সমূহের মধ্যে, কিন্তু ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার ভ্লাদিমিরের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পর থেকেই বিদ্যাচর্চার ব্যাপক প্রচলন ঘটে এবং চার্চ শ্লাভ ভাষায় বিভিন্ন বিষয় লিখিত হতে শুরু করে। রুশীয় ক্রনিকল সমূহে জ্ঞানী যরোশ্লাভের (১০৩৬-৫৪) আমলের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন লেখমালা ও অস্ট্রোমির গসপেল (১০৫৬) ইত্যাদি পাণ্ডুলিপিতে মূল রুশ ভূখণ্ডে রচিত চার্চ শ্লাভনিকের নিদর্শন পাওয়া যায়। আরও নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন

নভগোরড শহরের সন্নিহিত অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের ফলে, অধিকাংশই পত্রাবলী, বার্চের ছালের উপর লেখা।

॥ ৩ ॥

পূর্বদিকে চার্চ শ্লাভনিকের ব্যবহার অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ছিল, যদিও ব্যবসায়িক চিঠিপত্র ও অপরাপর রচনায় স্থানীয় ভাষা সমূহের প্রভাব কিছু কিছু পড়তে শুরু করেছিল। রুশিয়ার আধুনিক সাহিত্যের ভাষা গড়ে উঠেছে চার্চ শ্লাভনিকের সঙ্গে বৃহৎ-রুশ কথ্য ভাষার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ইউক্রেনে ব্যাপারটা এরকম ঘটেনি। ইউক্রানীয়রা মূলনীতি হিসাবে চার্চ-শ্লাভনিককে বর্জন করেছিলেন এবং নিজেদের কথ্যভাষার উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়েছিলেন। আদিতম ইউক্রানীয় সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে ত্রয়োদশ শতকের ছ'চারটি রচনার উল্লেখ পণ্ডিতেরা করে থাকলেও অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী এমন কোন রচনার উল্লেখ করা যায় না যাকে বিশুদ্ধ ইউক্রানীয় বলা চলে, এবং সত্য বলতে কি, সাহিত্য রচনার মাধ্যম হিসাবে ইউক্রানীয় ভাষা ১৮৪০ খৃষ্ঠাব্দের আগে গড়ে ওঠেনি। বাইলোরুশীয়রা অবশ্য চার্চ-শ্লাভনিককে বর্জন করেননি এবং তাঁরা নিজস্ব ভাষা গড়ে তুলেছিলেন ষোড়শ শতক থেকে, কিন্তু সত্যকার বাইলোরুশীয় সাহিত্য গড়ে উঠতে সময় লেগেছিল আরও তিনশো বছর, বিশ শতকের আগে বাইলোরুশীয় সাহিত্য বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বাইলোরুশীয় ভাষায় সাত মিলিয়ন মানুষ কথাবার্তা বলেন, এবং এই ভাষার দুটি ধারা বর্তমান, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম।

হয়ত পূর্ব শ্লাভীয় ভাষা পরিবার চার্চ-শ্লাভনিককে এড়িয়ে যেতে পারত, কিন্তু চতুর্দশ শতকে তুর্কী আক্রমনের ফলে যখন সার্বীয় ও

বুলগেরীয় পণ্ডিতেরা রুশিয়ায় আশ্রয় প্রার্থী হলেন, তখন চার্চ-শ্লাভনিকের দ্বিতীয় তরঙ্গ রুশিয়ার উপর দিয়ে প্রবাহিত হল। তথাপি চার্চ-শ্লাভনিকের সঙ্গে বৃহৎ-রুশ কথ্য ভাষার সমন্বয় হতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল উলোঝেনিয়ে (*Ulozhenie*) যা স্থানীয় আইন সমূহের সংকলন। এখানে চার্চ-শ্লাভনিকের সঙ্গে বৃহৎ-রুশ কথ্য ভাষার সংযোগের চিহ্ন পাওয়া যায়, কিন্তু ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে রচিত আভাকুমের আত্মজীবনীতে চার্চ-শ্লাভনিকের প্রভাব একান্তই নগণ্য। এই গ্রন্থটি আগাগোড়াই কথ্য বৃহৎ-রুশ ভাষায় রচিত।

সম্রাট পিটার দি গ্রেট রুশিয়ার জন্য পশ্চিমের দরজা উন্মুক্ত করে দেন। যার ফলে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষার শব্দ-সমূহ দ্রুত রুশিয়ায় অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। কোন কোন রুশীয় পণ্ডিত বিদেশী শব্দসমূহ বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেননি, যেমন অষ্টাদশ শতকের প্রখ্যাত ভাষাবিদ পণ্ডিত ত্রেদিয়াকোভস্কি (মৃত্যু ১৭৬৯) চেয়েছিলেন শ্লাভনিক উপাদান থেকেই নতুন শব্দসমূহ সৃষ্টি করতে।

অষ্টাদশ শতকেও রুশ ভাষার প্রকৃতি এলোমেলো ছিল। ওই শতকেরই অন্যতম প্রখ্যাত পণ্ডিত মিখাইলো লেমোনোসোভ (মৃত্যু ১৭৬৫) তৎকালীন প্রচলিত রচনা সমূহে ব্যবহৃত ভাষাকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছিলেন। প্রথম স্তরটি হচ্ছে "মহৎ সাহিত্যে" (অর্থাৎ ট্রাজেডি ও উচ্চমার্গের গীতিকবিতা) ব্যবহৃত ভাষা যেখানে চার্চ-শ্লাভনিকের প্রাধান্য, দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে "নিম্নমার্গী সাহিত্য" (অর্থাৎ গল্প সাহিত্য, কমেডি ইত্যাদি) ব্যবহৃত ভাষা যা মূলত কথ্য বৃহৎ-রুশ, তৃতীয় স্তরটি প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্যবর্তী। কালক্রমে এই তৃতীয় স্তরটিই প্রাধান্য লাভ করে, এবং এই স্তরের ভাষাতেই রচিত হয় ফোনভিজিনের (*Fonvizin*) কমেডি সমূহ, ক্রাইলোভের

(*Krylov*) গল্প সমূহ এবং কারামজিনের (*Karamzin*) রুশ রাষ্ট্রের ইতিহাস, এই তৃতীয় স্তরটিকেই উন্নত, প্রামান্য এবং সর্বগ্রাহ্য সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করেন পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৬)।

॥ ৪ ॥

আগেই বলেছি, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ট্রান্সককেশীয় যুক্তরাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে তার জায়গায় তিনটি পৃথক রিপাবলিকের সৃষ্টি করা হয়েছিল—আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া। আজারবাইজানের প্রধান ভাষা আজেরির উৎস তুর্কী, আমরা সে আলোচনায একটু পরে আসছি। আর্মেনিযা প্রজাতন্ত্রের অধিবাসী এবং জগতের অন্যত্র ছড়িয়ে থাকা আর্মেনিয়দের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষের কাছাকাছি। আর্মেনীয ভাষা খুবই প্রাচীন, তবে ক্লাসিকাল আর্মেনিয়ান বলতে যা বোঝায় তা খৃষ্টীয পঞ্চম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা। গ্রীক হরফ অনুসরণে আর্মেনিয লিপির সৃষ্টি করে ছিলেন মেসরোব মাশতোৎস নামক জনৈক ধর্মযাজক প্রাচীন আর্মেনীয ভাষা গ্রাবর (*Grabar*) নামে পরিচিত। গ্রাবর কথাটির অর্থ পুস্তক-সম্বন্ধীয়। পরবর্তীকালে আর্মেনীয ভাষার দুইটি বাক্‌ধারার পরিচয় পাওয়া যায়, পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয। উনিশ শতকে এই দুটি ধারায় সংমিশ্রণ হয় এবং তার ফলে আশখ্‌রহাবর (*Ashkharhabar*) বা আধুনিক আর্মেনীয় 'জনগনের ভাষা' গড়ে ওঠে। জর্জীয় ভাষা আর্মেনীয় ভাষারই স্বজাতি এবং নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহের স্বানীয়, মিঙ্গরেলীয়, লাজীয় প্রভৃতি দক্ষিণ ককেশীয় ভাষার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত। জর্জীয় ভাষা খুবই পুরাতন, এমন কি পঞ্চম শতকের কোন কোন লেখমালাতেও প্রাচীন জর্জীয় ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। দশম ও একাদশ শতক

থেকেই জর্জীয় ভাষার উন্নতির কাল এবং ওই সময়ের জর্জীয় ভাষাই ক্লাসিকাল জর্জিয়ান নামে পরিচিত। জর্জীয় ভাষায় আর্মেনীয় ও গ্রীক থেকে প্রচুর শব্দ গৃহীত হয়েছে। জর্জীয় বর্ণমালার সৃষ্টিকাল পঞ্চম শতক, সম্ভবত খৃষ্টীয় প্রচারকদের চেষ্টায় তা রচিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আরও যে পাঁচটি প্রজাতন্ত্র সোভিয়েট ইউনিয়নে যুক্ত হয় সেগুলির নাম যথাক্রমে কারেলিয়া, এস্তোনিয়া মোলডাভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও ল্যাটভিয়া। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের পর অবশ্য পৃথক রিপাবলিক হিসাবে কারেলিয়ার অস্তিত্ব নেই, তা রুশীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়ে উক্ত প্রজাতন্ত্রের একটি স্বায়ত্ত শাসিত এলাকায় পরিণত হয়েছে। কারেলিয়ার ভাষার নাম কারেল বা রুশ-কারেল, যা আসলে ফিনল্যাণ্ডে প্রচলিত ফিনীয় ভাষারই একটি আঞ্চলিক রূপ। এস্তোনীয় ভাষাও ফিনো-উগ্‌রীয় পরিবারের অন্তর্গত, এবং এই ভাষায় এস্তোনিয়ার সাড়ে বারো লক্ষ লোক কথা বলেন। এ ছাড়া এস্তোনিয়ায় লিভ ও ভোট নামক দুটি স্থানীয় ভাষাও প্রচলিত। সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত মোলডাভীয় প্রজাতন্ত্রের অবস্থান নিস্টার নদীর পূর্বদিকে। এই অঞ্চলটিকে পূর্বে বেসারবিয়া বলা হত। মোলডাভিয়ার অপর অংশ রুমানিয়ার অন্তর্গত। মোলডাভীয় প্রজাতন্ত্রের অধিকাংশ অধিবাসীদের ভাষা মোলডাভীয় এবং তা রুমানীয় ভাষারই একটি আঞ্চলিক রূপ। এই ভাষার উপর শ্লাভ প্রভাব ছাড়াও ল্যাটিনের প্রভাব প্রচুর পরিমানে আছে।

লিথুয়ানীয় ভাষায় তিরিশ লক্ষেরও বেশী মানুষ কথাবার্তা বলেন, এবং ইউরোপের বাইরেও লিথুয়ানিয়ার অধিবাসীরা যেখানে যেখানে বসতি স্থাপন করেছেন সে সকল স্থানেও নিজেদের ভাষার চর্চা বজায় রেখেছেন। লিথুয়ানীয় ভাষা দুটি শ্রেনীতে বিভক্ত—

নিম্ন লিথুয়ানীয় ও উচ্চ লিথুয়ানীয়। দ্বিতীয়টিই অধিকতর প্রাচীন। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় বাচনভঙ্গীর কিছুটা অংশ এখনো পর্যন্ত লিথুয়ানীয় ভাষায় বর্তমান। অনেক লিথুয়ানীয় শব্দ পরবর্তীকালে ফিনীয় মোর্দভিনীয়-চেরেমিশীয় ভাষাভাষী মানুষেরা গ্রহণ করেছেন। লিথুয়ানীয় ভাষা ল্যাটিন বর্ণমালায় লিখিত হয়। প্রাচীন ভাষা হলেও ষোড়শ শতকের পূর্বে রচিত লিথুয়ানীয় সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ল্যাটভীয় বা লেটীয় ভাষা বর্তমান ল্যাটভিয়ার কুড়ি লক্ষেরও বেশী মানুষের ভাষা। লিথুয়ানীয় ভাষার সঙ্গে এই ভাষার এত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা যে আদি পর্যায়ে উভয় ভাষার পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বতন্ত্রভাবে ল্যাটভীয় ভাষার বিকাশের কারণ বাইরের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার যোগাযোগ। দ্বাদশ শতক থেকেই ল্যাটভীয় ভাষার উপর জার্মান প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল এবং বহু জার্মান শব্দ এই ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। এই পদ্ধতি চলেছিল অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। ল্যাটভীয় ভাষা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য। মধ্য ল্যাটভীয়ই সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রামান্য। এই ভাষার কোন নিজস্ব লিপি নেই, ল্যাটিন লিপিতেই দীর্ঘকাল ধরে লিখিত হয়ে এসেছে। ল্যাটভীয় ভাষায় বানান ও শব্দ রচনার ক্ষেত্রে ছুরকম পদ্ধতি অনুসৃত হয়, একটি জার্মান ও অপরটি লিথুয়ানীয়। এস্তোনিয়া ল্যাটভিয়ার প্রতিবেশী হবার জন্য ফিনোউগ্রীয় ভাষাসমূহের প্রভাব ল্যাটভীয় ভাষার উপর বর্তমান।

॥ ৫ ॥

ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর এলাকার বাইরে ফিনো-উগ্রীয় গোষ্ঠীর কয়েকটি ভাষা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত।

এই ভাষা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, হয়ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর আবির্ভাবেরও আগে, যদিও কাল-ক্রমে শেষোক্ত গোষ্ঠীর বহু শব্দ ফিনো-উগ্রীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। মোট সাতটি বংশ ফিনো-উগ্রীয় গোষ্ঠীর সদস্য : ল্যাপ, বালটীয়-ফিনীয়, মোর্দভিন, চেরিমিস, পেরমীয়, ওব-উগরীয় এবং ম্যাগিয়ার।

ল্যাপ ভাষায় তিরিশ হাজারেরও বেশী বলগা-হরিণ প্রতি-পালক, মৎস্যজীবি ও কৃষক কথা বলেন যাঁদের বাসস্থান মোটামুটি নরওয়ে, সুইডেন এবং ফিনল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চল এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের কোলা উপত্যকা। এই ভাষার কয়েকটি আঞ্চলিক রূপও আছে। বালটীয়-ফিনীয় বংশটি নিম্নলিখিত ভাষাগুলির সমবায়ে গঠিত : (১) ফিনীয়, অর্থাৎ ফিনল্যাণ্ডের প্রধান কথ্য-ভাষা, তবে ফিনল্যাণ্ড ছাড়াও সুইডেন, নরওয়ে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তর পশ্চিমে এই ভাষা কোথাও কোথাও চালু আছে ; (২) রুশ-কারেল, কারেলিয়া স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের ভাষা; (৩) ওলোনেট্স্, লাদোগা অঞ্চলের ভাষা; (৪) লাইভি; (৫) ভেপসি; ওনেগা হ্রদের পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা; (৬) ভোট এবং (৭) এস্তোনীয়, এস্তোনিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রধান ভাষা। মোর্দভিন বংশের দুটি ভাষা (১) মোক্সা এবং (২) এরজা, দক্ষিণ ভল্গার উভয় তীরের দশ লক্ষ মানুষের কথ্য ভাষা। চেরিমিস হচ্ছে উরালের দক্ষিণাংশ এবং ভল্গার তীরবর্তী পৌনে চার লক্ষ মানুষের কথ্য ভাষা। পেরমীয় বংশের দুটি ভাষা (১) ভোটিয়াক, কামা ও ভ্যাট্কা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের সোয়া চার লক্ষ লোকের ভাষা, এবং (২) জাইরিয়ান, ব্যাচেক্দা, মেজেন, পেচোরা এবং কামা নদীর উপত্যকার আড়াই লক্ষ লোকের ভাষা। ওব-উগ্রীয় বংশের দুটি ভাষার নাম (১) ভোগাল ও (২) ওস্তিয়াক।

এই দুটি ভাষায় ওব এবং ইরতাইস নদীর উপত্যকার উপজাতিরা কথা বলেন। ম্যাগিয়ার ভাষা মূলত হাঙ্গেরীতে প্রচলিত, যার সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের অনেকগুলি ভাষার আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলেও সেখানে ম্যাগিয়ার ভাষী কোন জনসমাজ নেই।

॥ ৬ ॥

সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রজাতন্ত্রগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে রুশীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুর্কীস্থান অঞ্চলটিকে পৃথক করে নিয়ে সেখানে জাতীয়তার ভিত্তিতে পাঁচটি প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি করা হয়—উজবেক, তুর্কমেন, তাজিক, কাজাক ও কিরঘিজ। এই সকল স্থানের প্রচলিত ভাষা-সমূহের উদ্ভব হয়েছে তুর্কী থেকে। তুর্কীজাত এই ভাষাগুলিতে কথা বলেন আট মিলিয়নেরও বেশী লোক। চাঘতাই বা উজবেক শ্রেণীর ভাষাগুলিতে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়েছিল পঞ্চদশ শতক থেকে, তারপর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বুখারার আমীরৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের অঙ্গীভূত হয়ে গেলে সাধারণ উজবেক সাহিত্যের ভাষা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। প্রাক্-বিপ্লব যে সব তুর্কীজাত ভাষার কিছু কিছু সাহিত্য সম্পদ ছিল সেগুলি হচ্ছে তুর্কমেন, আজেরি, ক্রিমীয় ও কাজান-তাতার। এই ভাষাগুলির কোন কোনটি প্রাচীনকালে রুনিক লিপিতে লিখিত হত, পরবর্তীকালে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আরবী হরফে এবং ১৯২৪ এর পর থেকে রোমক হরফে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে এই সকল ভাষাগুলির ক্ষেত্রে সিরিলীয় হরফ ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে। বিপ্লবের পর তুর্কীজাত যে সব ভাষাগুলি উন্নত হয়ে সাহিত্য রচনার উপযোগী হয়েছে সেগুলির সংখ্যা আঠারটিরও বেশী।

তুর্কীশ্রেণীর ভাষাগুলি মঙ্গোলীয় এবং তুঙ্গুসীয় ভাষাগুলির

সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রতিটি ভাষার মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ খুবই কম, শুধু চুভাস ও ইয়াকুত এই দুটি ভাষা ছাড়া। তা ছাড়া প্রাচীন তুর্কীর সঙ্গে বর্তমান তুর্কী ভাষাগুলির প্রভেদ যৎসামান্য, দীর্ঘকালের ইতিহাসে তুর্কীর পরিবর্তন বড় একটা হয়নি। তুর্কী ভাষার সর্ব-প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় অষ্টম শতকে রচিত লেখমালাসমূহে যেগুলি পাওয়া গেছে ওরখোন ও ইয়েনিসি নদী উপত্যকা অঞ্চলে। ঐতিহাসিক বিচারে তুর্কী ভাষাগুলিকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়— প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। প্রাচীন তুর্কী বলতে ওরখোন ও ইয়েনিসি অঞ্চলের উক্ত লেখমালাগুলির ভাষাকেই বোঝায়। প্রাচীন উইগুর ভাষাও প্রাচীন তুর্কীর অনেকটা বজায় রাখতে পেরেছে। মধ্য তুর্কী দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত, পশ্চিমাঞ্চলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয়। পশ্চিমাঞ্চলীয় শ্রেণীর মধ্যে আছে কুমান ও কিপচক এবং পূর্বাঞ্চলীয় শ্রেণী কারা-খানিদ, খাওয়ারিজমি ও চাঘতাই ভাষাগুলির সমবায়ে গঠিত। আধুনিক তুর্কী চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত —দক্ষিণ পশ্চিম বা তুর্কমেন শ্রেণী, দক্ষিণপূর্ব বা চাঘতাই অথবা উজবেক শ্রেণী, উত্তর পশ্চিম বা কিপচক শ্রেণী এবং উত্তরপূর্ব বা উইগুর শ্রেণী।

দক্ষিণ পশ্চিম বা তুর্কমেন শ্রেণীর ভাষাগুলি সোভিয়েট-ইউ-নিয়ন ছাড়াও আরও বহু জায়গায় প্রচলিত। এই ভাষাগুলিকে মোট চারটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (১) প্রাক-অটোমান, অটোমান, আধুনিক তুরস্কের তুর্কী, আনাতোলিয়া ও বল্কান অঞ্চল সমূহের অটোমানীয় উপভাষা সমূহ, রুমানিয়ার গাগাউজ তুর্কী, বুলগেরিয়া, বোসনিয়া এবং ম্যাসিডোনিয়ার তুর্কীজাত উপভাষা-সমূহ এবং চুভাস; (২) আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র এবং উত্তর-পশ্চিম ইরাণে ব্যবহৃত আজেরি বা আজারবাইজানী; (৩) দক্ষিণ ইরাণে ব্যবহৃত কাশগাই, আইনালু এবং বাহারলু; (৪) এবং

তুর্কমেন প্রজাতন্ত্র, কারা কালপাক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, উজবেক প্রজাতন্ত্র, কাজাক প্রজাতন্ত্র ইরান ও আফগানিস্তানের অংশবিশেষে ব্যবহৃত তুর্কমেন ভাষা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ-পশ্চিম বা তুর্কমেন শ্রেণীর চারটি উপশ্রেণীর মধ্যে দুটি সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রচলিত।

দক্ষিণ পূর্ব বা চাঘতাই বা উজবেক ভাষাগুলি নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে প্রচলিত ঃ সিনকিয়াং এবং উইগুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলির কিয়দংশ, কারা কালপাক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের দক্ষিণাংশ, তুর্কমেন প্রজাতন্ত্রের পূর্বাংশ, তাজিক প্রজাতন্ত্রের উত্তর ও পশ্চিমাংশ, কাজাক প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণাংশ এবং উত্তর আফগানিস্তান। চাঘতাই সাহিত্যের ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

উত্তর পশ্চিম বা কিপচক শ্রেণীর ভাষাগুলি সাতটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত ঃ (১) কিরঘিজ প্রজাতন্ত্রে ব্যবহৃত কিরঘিজ ; (২) কাজাক প্রজাতন্ত্র, কারা কালপাক এবং মঙ্গোলিয়ার অংশবিশেষে ব্যবহৃত কাজাক ; (৩) কারা কালপাক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের অধিকাংশে ব্যবহৃত উক্ত কাজাকী ভাষার উপভাষা কারা কালপাক ; (৪) কারাচাই, চেরকেস এবং দাগেস্তানে 'ব্যবহৃত নোগাই ; (৫) দাগেস্তানে ব্যবহৃত কুমাইক ; (৬) বশকির স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে ব্যবহৃত বশকির ; (৭) এবং ভোলগা তাতার উপভাষা সমূহ, যেমন কাজান-তাতার, যা তাতার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের ভাষা, এবং উরাল অঞ্চলের, তোবোল এবং ইরতাইস নদী এলাকার ভাষাসমূহ।

উত্তরপূর্ব বা উইগুর শ্রেণীর ভাষাগুলি তিনভাগে বিভক্ত। (১) তুভা অঞ্চলে ব্যবহৃত তুভা ; (২) আবাকর এবং ইউজ স্তেপভূমি অর্থাৎ খাকাশ অঞ্চলের ভাষাসমূহ এবং চীনের কোন কোন অংশে প্রচলিত সারিগ উইগুর ; (৩) এবং বারাবে স্তেপ ও উত্তর আলতাই অঞ্চলের ভাষাসমূহ যথা তেলেঙ্গ, তোলোস এবং ইয়াকুত।

॥ রুশ সাহিত্য ॥

চার্চ-শ্লাভনিক ও বৃহৎ রুশ কথ্য ভাষার সমন্বয়ে আজকের রুশ ভাষা গড়ে উঠেছে, যে ভাষায় কথা বলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রায় পঞ্চান্ন ভাগ মানুষ। এই ভাষা গড়ে উঠতে সময় লেগেছিল অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। রুশ সাহিত্যকে পণ্ডিতেরা তিনটি যুগে বিভক্ত করে থাকেন—প্রাচীন সাহিত্য, প্রাক্-বিপ্লব সাহিত্য এবং বিপ্লবোত্তর যুগের সাহিত্য। প্রাচীন রুশ সাহিত্যের পরিধি ৯৮৮ থেকে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ রাজকুমার ভ্লাদিমিরের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের বছর থেকে সম্রাট মহান পিটারের নতুন রাজধানী পত্তনের বছর পর্যন্ত। প্রাক্-বিপ্লব সাহিত্যের পরিধি ১৭০৩ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত, বস্তুত আধুনিক রুশ ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ এই দুশো বছরের মধ্যেই ঘটেছে। বিপ্লবোত্তর যুগের সাহিত্য বলতে ১৯১৭ সালের পর থেকে রচিত সাহিত্যকেই বোঝায়, এই যুগটি রুশ সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশের যুগ।

প্রাচীন রুশ সাহিত্যের পরিধি, আগেই বলেছি, ৯৮৮ থেকে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাচীন রুশ সাহিত্যকে আবার চারটি যুগে ভাগ করা হয়। প্রথমটি হচ্ছে কিয়েভীয় যুগ। ইউক্রেনের অন্তর্গত কিয়েভ খৃষ্টীয় দশম শতক থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সংস্কৃতি চর্চার একটি বড় কেন্দ্র হিসাবে গড়ে

উঠেছিল। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলগণ কর্তৃক কিয়েভ দখলের পূর্ব পর্যন্ত যা কিছু রুশ সাহিত্যকর্ম এখানেহ রচিত হয়েছিল, তা অবশ্য চার্চ-শ্লাভনিক ভাষায়। দ্বিতীয় যুগের বিকাশ ছিল ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে তাতার সার্বভৌমত্বের অবসানের কাল পর্যন্ত, এবং এই যুগের সাহিত্য রচনার কেন্দ্র হিসাবে নোভোগোরোড, পস্কোভ এবং ৎভের প্রভৃতি স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় যুগটিকে বলা হয় মস্কোকেন্দ্রিক যুগ। এই যুগে মস্কোর গ্র্যাণ্ড ডিউকরা রুশিয়ার সম্রাট হয়ে বসেন এবং একটি শক্তিমান রুশ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই যুগের বিস্তৃতি ছিল ১৫৯৮ পযন্ত, অর্থাৎ আইভান দি টেরিব্‌লের পুত্র প্রথম থিয়োডোরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত। চতুর্থ যুগটিকে বলা হয় পরিবর্তনের যুগ, ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে জার মিখায়েল রোমানভের সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পিটার কর্তৃক সেণ্ট পিটার্সবার্গ নগরের পত্তন পর্যন্ত এই যুগটি বিস্তৃত ছিল।

কিয়েভীয় যুগের সৃষ্ট সাহিত্য সম্পদের অধিকাংশই মঙ্গোল আক্রমণে ধ্বংস হযেছে, যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা রক্ষিত আছে কয়েকটি ষোড়শ শতকের পাণ্ডুলিপিতে। এগুলি খৃষ্টীয় সাহিত্য, বিষয়বস্তু সাধুজীবনী, নীতিমূলক কাহিনী, প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইউরোপের প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষারই প্রারম্ভিক সাহিত্য প্রচেষ্টার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। প্রাক-খৃষ্টীয় ঐতিহ্যযুক্ত সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের কাহিনী পরবর্তী যুগের সাহিত্যে বিক্ষিপ্তভাবে স্থান পেয়েছে। অবশ্য কোন কোন দেশে, যেমন আর্মেনিয়ায়, প্রাক্-খৃষ্টীয বিষয়গুলিকে পৃথকভাবে সংগ্রহ করাব প্রচেষ্টা হয়েছে, কোন কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক, যেমন খোরেনের মোজেস, সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ রকম কোন একক প্রচেষ্টা আদি রুশ সাহিত্যে বড় একটা দেখা

যায় না। তথাপি কিয়েভীয় যুগে রচিত *Povest Vremennykh Let* বা "অতীত যুগের কাহিনী" নামক গ্রন্থটিকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে চলে না। সংগ্রাহক হিসাবে এই রচনাটির সঙ্গে যাঁরা সম্পর্কিত তাঁরা হচ্ছেন্ নেস্টর ও সিলভেস্টর। রচনাটির দুটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, একটি ১১১২ খৃষ্টাব্দের সংগ্রহ, অপরটিকে বলা হয় লোরেঞ্জীয় পাণ্ডুলিপি, প্রাপ্তিকাল ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ। দুটি সংগ্রহের মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই ভিন্নপাঠ পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে *Pouchenie*, অর্থাৎ কিয়েভের দ্বাদশ শতকের জ্ঞানী সম্রাট ভ্লাদিমির মনোমাখের "উপদেশসমূহ" বা "অন্তিম সিদ্ধান্ত।" রাজা মনোমাখ মারা যান ১১২৫ খৃষ্টাব্দে। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর পুত্রকে যে সব উপদেশ দিয়ে যান সেইগুলিই হচ্ছে এই রচনাটির উপজীব্য। কিয়েভের মেট্রোপলিটান ইলারিয়ন রচিত *Slovo O Zakone I Blagodati* অর্থাৎ "আইন ও নীতি সংক্রান্ত আলোচনা" আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা (একাদশ শতক)।

বাইজানসিয়াম থেকে অনেক রোমান্টিক কাহিনীও কিয়েভে আমদানী হয়েছিল, যেগুলি স্থানীয় কথক ও কবিয়ালগণ নিজস্ব করে নিয়েছিলেন। এই কাহিনীগুলির উৎস গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য, তা ছাড়া পশ্চিম এশীয়, পারসিক ও ভারতীয় উপাদানও আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ভারতীয় পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের বহু কাহিনী হাত বদল হতে হতে প্রাচীন জগতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছিল, উদাহরণ স্বরূপ বিখ্যাত কর্কটক-দমনক কথার উল্লেখ করা যায় যে কাহিনীটির আমরা আরবীয়, হিব্রু ও ল্যাটিন রূপান্তর দেখেছি। ১৫ শতকের রুশ সাহিত্যে এই একই কাহিনী স্তিফানিৎ ও ইখনিলাৎ-এর কাহিনীতে পরিবর্তিত হয়েছে।

ঠিক একই কথা বলা যায় "বারলাম ও জোসাফতের কাহিনী" সম্পর্কে। মূল কাহিনীটি ভারতীয়-বৌদ্ধ। নবম শতকেই আরবীয় ভাষার মারফত তা ইউরোপে পৌঁছায়, এবং ইউরোপের বহু সাহিত্যেই কাহিনীটি স্থান পেয়েছে, যদিও সোভিয়েট ভূমিতে কাহিনীটিকে প্রথম গ্রহণ করে জর্জিয়া। অবশ্য ভারত সম্বন্ধে তৎকালীন রুশীয়দের ধারণা ছিল ভাসা ভাসা, যা আমরা পরে দেখব। এ সকল ছাড়াও ছিল কিয়েভের নিজস্ব লোকসাহিত্য যেগুলিকে বলা হত বাইলিনী (*Byliny*)। অসম ছন্দে রচিত এই সকল বাইলিনী লোকমুখে গীত হত। বিষয়বস্তু ছিল বহু ও বিচিত্র, তবে বীরগাথাসমূহই প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। এই বীরগাথাগুলির মধ্যে আবাব বিভিন্ন যুগের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। অনেকগুলি আবার প্রাক্-খৃষ্টীয় যুগের ঐতিহ্য বহন করে। সপ্তদশ শতকে রিচার্ড জেমস নামক জনৈক ইংবাজ অনেকগুলি বাইলিনী সংগ্রহ করেছিলেন, পরবর্তীকালে আরও অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে রুশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কিরশা দানিলভ অজস্র বাইলিনি সংগ্রহ করেছিলেন। উনিশ শতকে উত্তর রুশিয়া থেকে আরও বহু এই জাতীয় রচনা সংগৃহীত হয়েছে যেগুলি প্রকাশিত করেছেন রাইবনিকভ (১৮৬১-৬৭), হিলফারডিং (১৮৭৩) মাবকভ (১৯০১), ওঙ্কুকভ (১৯০৪) এবং গ্রীগোরিয়েভ (১৯০৪-১০)। উত্তরাঞ্চলের জেলেদের মধ্যে যুগপরম্পরায় প্রচলিত লোকসঙ্গীত সমূহ সংগ্রহ করেছিলেন বারসোভ (১৮৭২), ধর্মমূলক এবং অপরাপর প্রাচীন সঙ্গীতের সংগ্রাহক ছিলেন সোবোলেভ্স্কি (১৮৯৫-১৯০২) এবং রুশীয় রূপকথা সমূহ সংগ্রহ করেছিলেন আফানাসিয়েভ (১৮৭০) এবং ওঙ্কুকভ (১৯০৩)। বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া তারিখগুলি প্রকাশ-

কালের। এগুলি ছাড়া আরও এক শ্রেণীর রচনার পরিচয় পাওয়া যায়, যেগুলিকে বলা হয় লেটোপিশি বা প্রাচীন বৃত্তান্ত সমূহের সংকলন। ক্রনিক্ল ধর্মী এই রচনাগুলি জাপানী কো-জি-কি, চৈনিক ই-কিং বা আমাদের দেশের পুরাণ সাহিত্যের মত। ইতিহাস নয়, তবে ঐতিহাসিক উপাদানে ভরপুর, সাহিত্য মূল্যও এগুলির বড় কম নয়। যুগের পর যুগ ধরে এই প্রাচীন বৃত্তান্ত সমূহ লোক পরম্পরায় চালু ছিল। লিখিত আকারে এগুলি রূপ পরিগ্রহ করেছে একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে। প্রাচীন রুশীয় বীরগাথা-গুলিকে বলা হত বোগাতাইরি। কখনো বা একটি চরিত্রকে উপলক্ষ করে অনেকগুলি উপকথার চক্র আবর্তিত হত, বৃটেনের রাজা আর্থারের মত। এই রকম একটি চরিত্র ছিলেন রাজকুমার ভ্লাদিমির।

কিন্তু কিয়েভীয় যুগের সর্বাধিক বিখ্যাত রচনা হচ্ছে "ইগোর গাথা" (*Slovo O Polku Igoreve*)। রুশ সাহিত্যে ইগোর গাথা একটি বিশিষ্ট ট্রাজেডি। আর্মেনীয় সাহিত্যের সাসুনের ডেভিডের মতই ইগোর জাতীয় বীর, বাওয়াল্‌ফ, নিবেলুঙ্গেনলিয়েড প্রভৃতি ইউরোপীয় ট্রাজিক মহাকাব্যগুলির নায়কের চরিত্রের অনু-করণেই ইগোর-চরিত্রকে গড়ে তোলা হয়েছে। হারকিউলেসের মত সকল মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও অপরাপর প্রাচীন মহা-কাব্যগুলির নায়কদের মতই এই সিংহ বিক্রম নায়ককে প্রতিকূল শক্তির চক্রান্তে ব্যর্থ হতে হয়েছে। ইগোর গাথার নায়ক কিন্তু ঐতিহাসিক পুরুষ। তিনি (১১৫১-১২০২) ছিলেন নোভোগোরদ-সেভার্স্ক ও চেরনিগোভের রাজা। তাঁর আমলে পোলোভৎসি অর্থাৎ কুমান বা কিপচক তুর্কেরা রীতিমত হামলা করেছিল। ইগোর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, এবং তিনদিন যুদ্ধের পর দুর্ভাগ্য-ক্রমে পরাজিত ও বন্দী হন। বিদেশীদের বিরুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও

আত্মত্যাগ তাঁকে রুশিয়ার জাতীয় বীর করে তোলে এবং তাঁর মৃত্যুর অত্যাল্পকাল পরেই তাঁকে অবলম্বন করে অনেক কাহিনী রচিত হয়। বর্তমান ইগোর-গাথা ষোড়শ শতকের একটি পুঁথি থেকে প্রাপ্ত, যা কাউন্ট আলেক্সি মুসিন-পুস্কিন ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন এবং তা প্রকাশিত হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের মস্কো অগ্নিকাণ্ডে ইগোর-গাথা ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু পরে তার পুনঃ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। সাহিত্যকর্ম হিসাবে ইগোর-গাথা অত্যন্ত উচ্চস্তরের সৃষ্টি, এবং বোধহয় এই কারণেই কোন কোন পণ্ডিত এটিকে একটি জালিয়াতি হিসাবে প্রমাণ করতে আদাজল খেয়ে লেগেছিলেন, যথা আঁদ্রে মাজোঁ তাঁর *Le Slovo d' Igor* (প্যারিস ১৯৪০) গ্রন্থে।

রুশ সাহিত্যের আদিপর্বের দ্বিতীয় যুগের পরিধি ১২৪০ থেকে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগে কিয়েভের রাজশক্তির পতন হয়েছে এবং তাতার আক্রমণে সমগ্র রুশিয়া ছিন্নভিন্ন। বাইরের সঙ্গে রুশিয়ার যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। এই ছন্নছাড়া যুগের আশা আকাঙ্খা এই যুগের সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা "আলেকজাণ্ডার নেভস্কির জীবনী" নামক গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করতে পারি। এই রচনাটির লেখকের নাম অজ্ঞাত, সম্ভবত তিনি ছিলেন মধ্য রুশিয়ার সুজ্‌দল অঞ্চলের অধিবাসী। আলেকজাণ্ডার নেভস্কি ঐতিহাসিক পুরুষ যাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১২৬৩ খৃষ্টাব্দে। বর্তমান রচনাটিতে ওই সম্রাটের জার্মান জাতিদের উপর ১২৪২ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত বিজয়লাভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাতার আক্রমণ প্রতিরোধের কাহিনীও এতে স্থান পেয়েছে। তদানীন্তন রুশিয়ার ছন্নছাড়া পরিবেশে জাতিকে প্রেরণা জোগাতে সক্ষম এই রকম রচনার চাহিদা মেটাতেই বোধহয় এই জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

তদানীন্তন সংকট শুধু রাজনৈতিকই ছিল না, রুশিয়ার খৃষ্টীয় সংস্কৃতিও মুসলিম আক্রমণকারীদের দ্বারা বিপন্ন হতে চলেছিল। "ভারতীয় সাম্রাজ্যের কাহিনী" (*Skazanye Indiiskom Tsarstve*) নামক চতুর্দশ শতকে রচিত একটি গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে ভারত-বর্ষে একটি পরাক্রান্ত খৃষ্টান রাজত্ব বর্তমান। যদিও রচনাটির আগাগোড়াই উদ্ভট এবং লেখকের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না, তথাপি এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে স্বদেশে খৃষ্টধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখে লেখক একটি সুসমৃদ্ধ খৃষ্টান রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন এবং ভাবতবর্ষের মধ্যে সেরকম একটি রাষ্ট্রকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। চতুর্দশ শতকের একটি ব্যঙ্গমূলক রচনার নাম "বন্দী দানিয়েলের আবেদন" (*Nolenie Daniila Zatochnika*) যে গ্রন্থের বিষয় বস্তু হচ্ছে পেরেয়াস্লাভ্লের রাজ পুত্রের নিকট-জনৈক নির্বাসিতের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার আবেদন। লেখক অত্যন্ত নারী বিদ্বেষী, এ ছাড়া সামন্ততন্ত্র ও গীর্জার বিরুদ্ধেও তাঁর অভিযোগ আছে। অলংকারবহুল ভাষা সত্ত্বেও সাহিত্য হিসাবে এই রচনাটিব মান অত্যন্ত নীচু।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে মঙ্গোল আক্রমণের কাহিনীসমূহ অবলম্বনে অনেকগুলি ক্রোনিক্ল রচিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকের একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম *Zadon Shchina* অর্থাৎ "ডনের ওপারের কার্যকলাপ"। এটি আগাগোড়াই একটি বীররসপূর্ণ রচনা। এই গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীটিও ঐতিহাসিক, কুলিকোভো প্রান্তরে খান মামাই-এর উপর মস্কোর দিমিত্রি দোনস্কয়ের বিজয়লাভের কাহিনী। পঞ্চদশ শতকে রচিত আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম *Khozhdenie Za Tri Morya* যার অর্থ "তিন সাগরের ওপারে"। গ্রন্থটি একটি ভ্রমণ কাহিনী যার লেখক আফানাসি নিকিতিনা। এই বিখ্যাত পর্যটক

১৪৬৬ থেকে ১৪৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর জানা পৃথিবীর নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষেও এসেছিলেন এবং ভারত সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বিবরণও উক্ত রচনায় রেখে গেছেন। অবশ্য তাঁর ভারত সম্পর্কিত আলোচনা মালাবার উপকূল ও বিজয় নগর সাম্রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ ছাড়া পঞ্চদশ শতকে ল্যাটিন ও অপরাপর সাহিত্য বা ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত অনেক কথা ও কাহিনীর অনুবাদ অথবা রুশীকরণ হয়।

প্রাচীন রুশ সাহিত্যের মস্কোকেন্দ্রিক যুগের বিকাশ কাল ১৪৮০ থেকে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা হয়। ষোড়শ শতক থেকেই শক্তিমান রাষ্ট্র হিসাবে রুশিযার উদ্ভব শুরু হয়েছিল। সম্রাট আই-ভান দি টেরিবল নিজে একজন দার্শনিক ছিলেন এবং তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন আন্দ্রেই কুর্বস্কি। উভযের দার্শনিক বিতণ্ডা নিঃসন্দেহে প্রাচীন রুশ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। উক্ত সম্রাটের সভাসদ ও অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিলেন ইভান পেরেস্‌ভেতোব। সম্রাটেব স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ-কর্মকে যুক্তির দ্বারা সমর্থন করার অভিপ্রায়ে তিনি লিখেছিলেন *Skazanie o Magmete Saltane* অর্থাৎ “সুলতান মাহমুদেব কাহিনী”। ষোড়শ শতকে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি ইতিহাস গ্রন্থও রচিত হয়েছিল যেগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য *Istorya o Kazanskom Tsarsteve* অর্থাৎ “কাজান সাম্রাজ্যের ইতিহাস”। ষোড়শ শতকে রুশিয়ার ধর্মক্ষেত্রেও নানাপ্রকার পরিবর্তনের চিহ্ন প্রকটিত হতে শুরু করে। রুশিয়ার খৃষ্টধর্মের যে ধারাটি প্রচলিত ছিল তা প্রাচীন গ্রীক গীর্জা আশ্রয়ী, পক্ষান্তরে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ ছিল রোমক গীর্জার আশ্রিত। ল্যাটিন ভাষায় রোমক গীর্জা অনু-মোদিত ধর্মচর্চার জন্য অজস্র গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, কিন্তু গ্রীক গীর্জা অনুমোদিত ধর্মচর্চার জন্য রচিত পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল।

ধর্মীয় কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ল্যাটিন ভাষায় রচিত বহু পুস্তকের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল ডিসিপ্লিনা ক্লেরিকালিস। এই গ্রন্থটি অনুসরণে গ্রীক গীর্জা প্রস্তাবিত জীবনযাত্রা পদ্ধতির উপর দুটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, *Sto Glav* (শত অধ্যায়) এবং *Domostroy* (গার্হস্থ্য জীবন)। রুশিয়ায় ছাপাখানার প্রচলন হয় ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে।

১৬১৩ থেকে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সপ্তদশ শতক রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে পরিবর্তনের যুগ বলে চিহ্নিত। এই যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রুশ সাহিত্যের উপর পশ্চিমী প্রভাব, বিশেষ করে ল্যাটিন সাহিত্যের। ল্যাটিন সাহিত্য থেকে নীতিমূলক কাহিনীসমূহের রুশীকরণ মূলত পাদ্রীদের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। এই রকম দুটি সংকলনের পরিচয় পাওয়া গেছে। একটির নাম *Velikom T'sertsale* অপরটির নাম *Rimskikh Deyanii.* শেষোক্ত সংকলনটির উপর বিখ্যাত গেস্টা রোমানোরাম-এর প্রভাব স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। এগুলি ছাড়া স্বকীয় প্রচেষ্টা ছিল, যেমন *Povest O Shemyakinom Sude* অর্থাৎ "বিচারক সেম্য়াকের গল্প"। সপ্তদশ শতকের রুশ সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর সৃষ্টি হচ্ছে "আভাকুমের আত্মজীবনী" (*Zhitie Protopopa Avvakuma*)। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে চার্চ-শ্লাভনিক বর্জিত বিশুদ্ধ কথ্য রুশ গদ্যভাষায় রচিত আত্মজীবনীমূলক এই রচনায় আভাকুম আশ্চর্য লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। আভাকুম নিজে ছিলেন একজন ধর্মযাজক এবং তাঁর আমলে রুশ গীর্জায় বিভিন্ন উপদলের মধ্যে মতবাদগত সংঘর্ষ দেখা গিয়েছিল। আভাকুম একটি গোঁড়া উপদলের নেতা ছিলেন, এবং তাঁর গ্রন্থে নিজ মতবাদকে জোরের সঙ্গে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। নিজের আদর্শগত গোঁড়ামির জন্য আভাকুমকে ব্যক্তিগত জীবনে কম লাঞ্ছনা সহ্য করতে

হয়নি, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিহতও হতে হয়েছিল। আভাকুমের আত্মজীবনীর ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন জেন হ্যারিসন এবং হোপ মিরলীজ, এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। সপ্তদশ শতকেই রুশ ছন্দ একটি নির্দিষ্ট আকার পরিগ্রহ করে।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আলেক্সিয়াসের রাজসভায় প্রথম রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হয়েছিল এবং রুশ থিয়েটারের আদিপর্বে দুজন উৎসাহীর নাম পাওয়া যায়, একজন হচ্ছেন সিমেওন পোলোৎস্কি এবং অপর জন হচ্ছেন জোহান গোটফ্রিড গ্রীগোরি। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন জাতিতে জার্মান। উভয়েই বাইবেলের কাহিনী অনুসরণে নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু সত্য বলতে কি রুশ নাটককে একটি নির্দিষ্ট মানে পৌঁছাতে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ভলকভ নামক একজন ব্যবসায়ী রুশ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন যার পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন সুমরোকোভ (১৭১৮-১৭৭৭) যিনি নয়টি ট্রাজেডি, দুইটি গীতিনাট্য ও বারটি কৌতুক নাট্য রচনা করেছিলেন। নাট্যকারদের মধ্যে সুমরোকোভের উত্তরাধিকারী ছিলেন ফোনভিজিন (১৭৪৫-১৭৯২) যার বিখ্যাত কমেডির নাম "নাবালক" (*Nedorosl*)। নাটকটি ব্যঙ্গমূলক, ভূমিদাস প্রথার প্রতি নাট্যকারের তীব্র আক্রমণ মাঝে মাঝে এই রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। ফোনভিজিনের সমকালীন ছিলেন আলেকজাণ্ডার আবলেসিমোভ (১৭৪২-১৭৮৩) যিনি কৌতুক অপেরার লেখক হিসাবে বিখ্যাত। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার নাম "কলওয়ালা, যাদুকর, হাতুড়ে ও দেশলাই নির্মাতা"।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পিটার দি গ্রেট সেন্ট পিটার্সবার্গে নতুন রাজধানী স্থাপন করার পর থেকেই পশ্চিমের দরজা রাশিয়ার জন্য উন্মুক্ত হয়, এবং স্বয়ং সম্রাটের পাশ্চাত্যাভিমুখী মনোভাবের জন্য

ইউরোপের অপরাপর অংশ থেকে নানান ভাবধারা রুশিয়ায় অনুপ্রবিষ্ট হতে শুরু করে। পণ্ডিত প্রবর ভ্যাসিলি ত্রেদিয়াকোভস্কি রুশ কবিতার ক্ষেত্রে নতুন রীতির সৃষ্টি করেছিলেন, যা পরবর্তীকালের কবিগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়েছে। আন্তিয়োখ কান্তেমির (১৭০৮—১৭৪৪) প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি, যিনি জাতিতে ছিলেন রুমানীয় এবং অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত, এবং তাঁর রচনায় ফরাসী কবিতার প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সম্রাট পিটারের অনুসৃত নীতির ফলে রুশিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ফরাসী ভাষা বিশেষ কৌলিন্যের অধিকারী হয়েছিল। পরবর্তী বিখ্যাত কবি হচ্ছেন গাব্রিয়েল রোমানোভিচ দেরজাভিন (১৭৪৩-১৮১৬) যাঁর রচনার মধ্যে গ্রীক-রোমক কাব্যের যথেষ্ট প্রভাব আছে। তিনি রাণী ক্যাথারিনের রাজকবি হতে পেরেছিলেন, এবং কবি হিসাবে তিনি দৈহিক প্রেমের জয়গান গেয়েছেন।

মিখাইল লোমোনোসোভ (১৭১১-১৭৬৫) অষ্টাদশ শতকের একজন বহুমুখী প্রতিভা, যাঁকে আধুনিক রুশ সাহিত্যের জনক আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হবেনা। "রুশ ভাষার ব্যাকরণই" তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। তাঁর এই ব্যাকরণের ভূমিকায় একটি চিত্তাকর্ষক বাণী আছে: সম্রাট পঞ্চম চার্লস নাকি বলতেন, স্পেনীয় দেবগণের সঙ্গে কথা বলবার ভাষা, ফরাসী বন্ধুগণের সঙ্গে, জার্মান শত্রুদের সঙ্গে এবং ইটালীয় নারীসমাজে। কিন্তু যদি তিনি রুশ ভাষার সঙ্গে পরিচিত থাকতেন তাহলে বুঝতেন যে এই ভাষার প্রয়োগ ওই সব কটি ক্ষেত্রেই করা যায়। লোমোনোসোভ একই সঙ্গে কবিও ছিলেন, এবং কবিতার ক্ষেত্রে তিনি ত্রেদিয়াকোভস্কি প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। সম্রাট পিটারের উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত একটি বীররসপূর্ণ

কবিতা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর পর আসে অপর একজন মনীষী নিকোলাই কারামজিনের (১৭৬৬-১৮২৬) কথা। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে "রুশ রাষ্ট্রের ইতিহাস" যা বারো খণ্ডে রচিত। এ ছাড়া তিনি "হতভাগ্য লিজা" (*Bednaya Liza*) নামক একটি উপন্যাসেরও রচয়িতা। কারামজিনের উপর ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল। কেউ কেউ উক্ত উপন্যাসটির উপর স্যামুয়েল রিচার্ডসনের "পামেলা"-র প্রভাবের কথা বলেন। তাঁর অপর একটি রচনা "জনৈক রুশ পর্যটকের পত্রাবলী" (*Pisma Russkago Putesh-Estvennika*) লরেন্স স্টের্ণের "সেন্টিমেণ্টাল জার্ণি" অনুসরণে রচিত বলে কেউ কেউ মনে করেন। এছাড়া তিনিই হচ্ছেন রুশ সাহিত্যে প্রথম শেকসপীয়ার অনুবাদক, এবং তাঁর "জুলিয়াস সীজার" একটি প্রামাণ্য অনুবাদ। নাট্যকার ফোনভিজিনের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ স্মৃতিকথামূলক গদ্য রচনাও আছে। ব্যঙ্গমূলক রচনার জন্য আলেকজাণ্ডার রাদিসেভ (১৭৪৯-১৮০২) রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে চিরবিখ্যাত। তাঁর দুটি রচনা "মস্কো থেকে পিটার্সবার্গ" এবং "স্বাধীনতার প্রার্থনা" তাঁকে রাজরোষে পতিত হতে বাধ্য করে। তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন, পরে অবশ্য তাঁকে সাইবেরিয়ায নির্বাসিতের জীবন কাটাতে হয়।

উপরি-উক্ত সকল লেখকের রচনার মধ্যেই পশ্চিমী ভাবধারার প্রভাব বর্তমান যা সম্ভব হয়েছিল পিটার দি গ্রেট অনুসৃত নীতির ফলে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে শুরু করেছিল অষ্টাদশ শতক থেকেই সিসকোভ প্রভৃতির রচনায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও নতুন ভাবধারাসমূহ বর্জন করার জন্য এদের প্রচেষ্টা বড় কম ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঁরা সাফল্যলাভ করেননি। অষ্টাদশ শতকের

শেষভাগে এবং উনবিংশ শতকের প্রথম পর্যায়ে রুশ সাহিত্যে যে রোমান্টিক ধারার প্রবর্তনা হয় তার পুরোভাগে ছিলেন ভ্যাসিলি জুকোভ্‌স্কি (১৭৮৩-১৮৫২) যিনি ইংরাজী সাহিত্য থেকে বায়রণ, স্কট ও সাদের কবিতা, জার্মান থেকে গেটে, শিলার ও গ্রিমস ভ্রাতৃদ্বয়ের রচনাবলী এবং বহু ফরাসী ও ইতালীয় কবিতার রুশ তর্জমা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মহাভারতের জার্মান অনুবাদের থেকে তিনি নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানটি রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। নিকোলাই গ্নোদিত ছিলেন তাঁর বয়োকনিষ্ঠ সমকালীন যিনি গ্রীক থেকে হোমারের ইলিয়াড রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন আইভান ক্রাইলোভ যাঁর রচিত ফেব্‌ল বা কথামালা, ঈশপ ও পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ক্রাইলোভের · (১৭৬৯-১৮৪৪) কথামালার একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, অনুবাদক ছিলেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে রুশিয়ায় যে ডেকাব্রিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে দুজন কবি গড়ে ওঠেন, প্রথমজন কবি রাইলেভ (১৭৯৫-১৮২৬) যিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, এবং দ্বিতীয়জন কবি ভেস্তুমেভ যিনি নির্বাসিত হন। এঁরা ছাড়া উনিশ শতকের প্রথম দিকের খ্যাতিমান লেখকদের মধ্যে ছিলেন আলেকজাণ্ডার সের্গেইভিচ গ্রিরোয়দোভ (১৭৯৫-১৮২৯) যাঁর "বুদ্ধির বিপদ" নামক কৌতুকনাট্য তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। রুশ সাহিত্যে বাস্তববাদের ইনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ।

আলেকজাণ্ডার পুশ্‌কিনকে (১৭৯৯-১৮৩৭) দিয়ে রুশ সাহিত্যের নব দিগন্তের সূত্রপাত হয়। তিনি শুধু সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবেই বিখ্যাত নন, আধুনিক রুশ সাহিত্যের ভাষারও তিনি

অন্যতম স্রষ্টা। ঘটনা বৈচিত্রে ভরপুর পুশকিনের জীবন যা তাঁর পত্নীর বুদ্ধিভ্রংশতার জন্যই অকালে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল তা আলোচনা করার পরিসর এখানে নেই। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "রুসলান ও ল্যুডমিলা" ছয়টি সর্গে রচিত একটি রোমান্টিক কাহিনী এবং পরবর্তী রচনা "স্বাধীনতা"-র জন্য তাঁকে রাজরোষে পতিত হতে হয়েছিল। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "ককেশাসের বন্দী" মধ্য প্রাচ্যের পটভূমিকায় রচিত একটি রোমান্স যেখানে একটি সারকাসীয় রমণী ও একজন রুশ যুবকের প্রণয় ও ব্যর্থতার মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকা হয়েছে। এটির রচনাকাল ১৮২২। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "বাখ্‌চিসরাই-এর ঝরণা" (রচনাকাল ১৮২৭) অনুরূপ পটভূমিকায় রচিত। নায়িকা একটি পোলিশ তরুণী যে ক্রিমিয়ার খানের রাজপ্রাসাদের বন্দিনী। নির্দয় ও ক্রুরস্বভাব খান তার পানিপ্রার্থী কিন্তু অবাঙ্গী নায়িকা তাতে অসম্মত, সে স্বেচ্ছায় আত্মহননের পথ নিয়েছে। অপরদিকে ঈর্ষাপরায়ণা খানের পত্নী তাকেই সকল অশান্তির মূল মনে করে হত্যা করার পরিকল্পনা কার্যকর করেছে। এই পটভূমিকায় কাহিনী যখন চরম পরিণতি পাচ্ছে তখন তা একটি শোচনীয় ট্রাজেডিতে রূপ নিয়েছে। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল "ৎসিগানি" অর্থাৎ "বেদে" এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে "পোলিটাভা"। শেষোক্ত কাব্যটি সম্রাট পিটার দি গ্রেটের সঙ্গে দ্বাদশ চার্লসের যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ সম্ভবত "এভ্‌গেনিয়া অনেগিন। এটি রচনা করতে তাঁর সময় লেগেছিল দীর্ঘ আট বছর (১৮২৩-৩১)। রচনাটির মধ্যে বায়রণের প্রভাব থাকলেও নানান কারণে তা কালোত্তীর্ণ। এখানে বর্ণিত চরিত্রগুলি, যেমন অনেগিন, তাতিয়ানা, লেনস্কি, ওলগা ইত্যাদি, যেন আজও জীবন্ত। ১৮২৫

খৃষ্টাব্দে তিনি ষোড়শ শতকের শেষের দিকের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে "বোরিস বোদুনোভ" নামক একটি ট্রাজিক নাট্যকাব্য রচনা করেন শেকসপীয়ার অনুসরণে এবং তা প্রকাশিত হয় ১৮৩১-এ। এটি অবশ্য খুব সার্থক রচনা হয়নি, তবে উক্ত কাহিনী অবলম্বনে সঙ্গীতকার মুসর্গস্কি রচিত এবং রিমস্কি কারসাকভ সম্পাদিত একটি গীতিনাট্য আজও বিশেষ জনপ্রিয়। গদ্য রচনাতেও পুশকিন বিশেষ দক্ষতার নিদর্শন রেখেছেন। পুগাচেভ বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত "ক্যাপ্টেনের মেয়ে" (১৮৩৬) বিশ্বসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে "বেলকিনের গল্প" নামক সংকলন এবং "ইস্কাবনের বিবি" বিখ্যাত। খণ্ড কবিতার ক্ষেত্রেও পুশকিনের সাফল্য বিস্ময়কর।

সকল দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখা যায় যে মাঝে মাঝে এমন বিস্ময়কর প্রতিভার আবির্ভাব হয় যে তাঁরা সামগ্রিকভাবেই সাহিত্যের গতিকে একটা গুণগত পবিবর্তনের দিকে ঠেলে দিতে সক্ষম হন। পুশ্‌কিন সেই বিরলসংখ্যক প্রতিভাবানদের অন্যতম। পুশ্‌কিনকে কেন্দ্র করে তাঁর অনুরাগী একটি সাহিত্যিক চক্র গড়ে উঠেছিল, যাদের মধ্যে তিন জন কবির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা হচ্ছেন উগেন বারাতিনস্কি, নিকোলাস ইয়াজকোভ এবং আইভান কোজলভ।

পুশ্‌কিনের উত্তর সাধকদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য মিখাইল ইয়েরোভিচ লেরমোন্তোভ (১৮১৪-১৮৪১)। তাঁর মাত্র সাতাশ বছরের জীবন উচ্ছৃংখলতায় পূর্ণ ছিল, এবং পুশকিনের মতই তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রাণ হারান। তাঁর কবিতাসমূহের মধ্যে একটি বন্য উদ্দামতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চার শতাধিক খণ্ড কবিতা রচনা করেছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করেছিলেন মাত্র আঠাশটি। তাঁর

প্রথম বয়সের রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *Posledniysyn Volonsti* বা স্বাধীনতার শেষ সন্তান, নবম শতকের ভাইকিং আক্রমণের বিরুদ্ধে নভগোরদের প্রতিরোধ সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর নাটক, 'মুখোস-উৎসব' (*Masquerade*) প্রকাশিত হয় যার কাহিনী বহুলাংশে শেকস্পীয়ারের ওথেলোর অনুরূপ। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'দানব' ১৮৩৮খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, যে কাব্যের নায়িকা তামারা প্রেম ও শুদ্ধতার প্রতীক, এবং তাকে কবলস্থ করার জন্য শয়তানের দারুন প্রচেষ্টা এবং ব্যর্থতাই এই কাব্যের উপজীব্য। তাঁর অপর বিখ্যাত রচনা হচ্ছে *Mtsyri* বা 'দীক্ষিত' যেখানে একটি সন্ন্যাসীর মঠে বন্দী নবদীক্ষিত এক যুবকের পরিত্রাণলাভের আকুল প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতার কাহিনী অবলম্বনে একটি গভীরতর সত্যকে তুলে ধবার চেষ্টা করা হয়েছে। লেরমোন্তোভের গল্পগ্রন্থ "একালের নায়ক" পাঁচটি গল্পের সংকলন।

রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের আরও একজন কালজয়ী পুরুষ হচ্ছেন নিকোলাই ভ্যাসিলেইভিচ গোগোল (১৮০৯-১৮৫২)। পুশকিনের পর গোগলই রুশ ভাষা ও সাহিত্যকে আরও একটি উন্নততর পর্যায়ে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। গোগোল শুধু জন্মেই ইউক্রানীয় ছিলেন না, তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে তিনি ইউক্রানীয় ঐতিহ্যকেই তুলে ধরেছিলেন। ইউক্রানীয় জীবন-ধারার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর গল্পগ্রন্থসমূহে, যেগুলির মধ্যে বিখ্যাত "দিকানকি নদীবক্ষে সন্ধ্যা" এবং "মীর গাবাদ।" তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস "তারাশ বুলবা" কশাক বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত, শত্রুদের বিরুদ্ধে ইউক্রানীয়দের প্রতিরোধের এক মহৎ কাহিনী। তাঁর কৌতুকনাট্য "রেভিজর" (বড় সাহেব) আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা

এবং তা আশ্রয়া সমাজের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ। বড় সাহেব পরিদর্শনে আসবেন এই সংবাদে বিভিন্ন মহলে কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, কে কিভাবে তাঁকে খুশী করবে তা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে, এই কৌতুককর পটভূমিকাতে নাটকটি গড়ে উঠেছে। গোগোলের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান "মৃত আত্মা" (*Mestvyie Dushi*)। রুশিয়ার ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে এই রচনায় লেখকের তীব্রতম ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। সে যুগে রুশিয়ায় যার যত ভূমিদাস ছিল সে তত ধনী বলে গণ্য হত, এবং ভূমিদাসের সংখ্যার ভিত্তিতেই নানাপ্রকার সামাজিক সুখ সুবিধা আদায় করা যেত। বর্তমান রচনার নায়ক রাতারাতি ধনী হবার ফিকিরে মৃত বেওয়ারিশ ভূমিদাস কেনা-বেচার ব্যবসা শুরু করে দিল অদ্ভুত উপায়ে। "মৃত আত্মা"-র প্রথম খণ্ডটি সারাদেশ জুড়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যে প্রতিবাদ গোগোল ওই প্রথম খণ্ডে তুলেছিলেন, দ্বিতীয় খণ্ডে তা ততখানি সেচ্চার রাখতে পারেননি। তার কারণ জীবিকার প্রয়োজন। একদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার প্রবলতম চেতনা, অপরদিকে নিছক পেটের তাগিদে তার সঙ্গে আপোষ, এই উভয়ের দ্বন্দ্বে গোগোল শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে যান। রুশ সাহিত্যে গোগোলের অবদান সম্পর্কে পরবর্তীকালের এক বিখ্যাত সাহিত্যিক বলেছিলেন ঃ আমরা গোগোলের "ওভারকোট" থেকে উৎপন্ন। বলা বাহুল্য "ওভারকোট" তাঁর একটি বিখ্যাত গল্পের নাম।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বিবরণ সম্পূর্ণ হবে না যদি আমরা ওই যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন সর্বদেশের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক ভিসারোন গ্রীগোরিয়োভিচ বেলিনস্কির (১৮১১-১৮৪৮) নাম না করি। বস্তুত পরবর্তীকালের রুশ সাহিত্যে শুধু পরিমাণের দিক থেকেই নয়, গুণের দিক দিয়েও

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছিল তার মূলে বেলিনস্কির অবদান সর্বাধিক। বেলিনস্কি বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ছিলেন, স্বাভাবিকভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের উপর তাঁর প্রচণ্ড দখল ছিল, কাজেই সমালোচক হিসাবে তিনি সাহিত্য রচনার একটি সুনির্দিষ্ট মানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যোগ্য সমালোচক না থাকলে লেখকের রচনার উৎকর্ষ আশা করা যায় না।

গোগোল-পরবর্তী যুগের রুশ সাহিত্যে এক নতুন ধরণের বাস্তবতা দেখা যায়, যেখানে লেখকেরা জীবনকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখেছেন। এই নতুন ধারার লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ইভান আলেকজান্দ্রোভিচ গনচারভ (১৮১২-৯১) যাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা *Oviyknobennaya Storiya* (১৮৪৭)। এই রচনায় দেখানো হয়েছে কিভাবে মানুষ সমস্ত আদর্শবাদে ক্রমে ক্রমে আস্থা ত্যাগ করে বৈষয়িক মানুষে পরিণত হয়। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ওভলামভ' (*Oblamov*) রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে ক্লাসিক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। ১৮৫৯-এ প্রকাশিত এই উপন্যাসে গনচারভ তাঁর সমসাময়িক সমাজের নিষ্ক্রিয়তাকে তুলে ধরেছেন। সমকালীন রুশ অভিজাতরা সারা দেশজোড়া যে কর্মবিমুখ মনোভাব নিজেদের আচরণের দ্বারা গড়ে তুলেছিল নায়ক ওভলামভ তাদেরই প্রতিনিধি। গনচারভের তৃতীয় গ্রন্থের নাম *Obreev* বা খাদের কিনারায়। ১৮৬৯-এ প্রকাশিত এই উপন্যাসটি আসলে তাঁর পূর্বোক্ত দুটি উপন্যাসেরই ফলশ্রুতি, বলাই বাহুল্য বক্তব্যের বিচারে। নাটকের ক্ষেত্রে আলেকজান্দার নিকোলোভিচ অস্ত্রোভস্কি (১৮২৩-৮৬) যুগান্তর নিয়ে আসেন। অস্ত্রোভস্কি বারোটি নাটক রচনা করেছিলেন; যেগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে 'ঝড়', যাতে ধনিকশ্রেণীর অর্থলোভের কাছে মানুষের মানবিক স্বাভাবিক

সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনদের সম্পর্ক কিভাবে বিনষ্ট হয় তার করুণ ছবি আঁকা হয়েছে। 'প্রেয়সী' ছাড়া 'দেউলিয়া' 'দারিদ্র্য অপরাধ নয়' 'অভাগিনী বধূ' 'উষ্ণাদ টাকা' প্রভৃতি নাটকেও তাঁর সত্যসন্ধানী বাস্তব সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে অপরাপর যাঁদের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রঙ্গ নাট্যকার সুখভো কবাইলিন কথাসাহিত্যিক নিকোলাই প্রসিয়ালোভ্স্কি ও উসপেনস্কি, ঔপন্যাসিক নাট্যকার ও গল্পকার আলেক্সি পিসেমস্কি, কবি ইভান নিকিতিন, গ্রীগোরিয়েভ, নেক্রাসফ, তিয়ুচেফ, আলেক্সি টলস্টয়, আফানাসিফেৎ আপেখতিন, প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে ফেৎ, আপেখতিন, গ্রীগোরিয়েভ ছিলেন রোমান্টিক কবি, তিয়ুচেফও ছিলেন অন্তর্মুখী গীতিকবিতার জন্য প্রসিদ্ধ, আলেক্সি টলস্টয় ঐতিহাসিক গাথা ও হাস্যরসাত্মক কবিতার জন্য উল্লেখযোগ্য, কিন্তু একমাত্র নেক্রাসফ ছাড়া মেজর পোয়েট হিসাবে কাউকে আখ্যা দেওয়া যায় না। নেক্রাসফের কবিতা বাস্তবতার লক্ষণাক্রান্ত, তাতে আদর্শ নিষ্ঠা ক্রোধ, বেদনা সব কিছুরই প্রতিফলন আছে, কাব্য হিসাবে সেগুলি আশ্চর্য জীবন্ত।

উনিশ শতকের মধ্য পর্যায়ে হেৎসেন, বাকুনিন, চের্নিশেভ্স্কি, দোব্রোলুবিফ প্রভৃতি রুশ চিন্তানায়কগণ সমকালীন চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দেন। জাতীয় জীবনের নানাক্ষেত্রে কিছু কিছু উন্নতির লক্ষণও এই সময় দেখা দেয়। জাতীয়তাবোধও নতুন করে জেগে ওঠে, ফলে জার শাসিত সাবেকি ধরনের শোষণভিত্তিক ও পীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করার প্রবণতা জেগে ওঠে। ১৮৬০ সাল থেকে রুশ সাহিত্যে নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটে, যার সূচনা করেন ইভান

তুর্গেনেফ (১৮১৮-৮৩)। ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তুর্গেনেফের রীতিমত পরিচয় ছিল। তাঁর জীবনের অনেকটা অংশও কেটেছিল ইউরোপের নানাস্থানে। তাঁব প্রথম গল্পগ্রন্থ 'শিকারীর রোজনামচা' ১৮৪৭ থেকে ১৮৫২ র মধ্যে রচিত। এই গল্পগুলিতে রুশিয়ার গ্রামজীবন, তার সমস্যাসমূহ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। এই সংকলনটির জন্য তাঁকে রাজরোষে পতিত হতে হয়েছিল। পরবর্তী রচনা 'রুদিন' উপন্যাসে তুর্গেনেফ এক অভিজাত বুদ্ধিজীবির ব্যর্থতার চিত্র অঙ্কিত কবেছেন। 'বাবুদের বাসা' উপন্যাসে একজোড়া হতভাগ্য যুবক যুবতীর কথা বলা হয়েছে। সরল হৃদয় নায়ক তারই বিচার বুদ্ধির দোষে তার দাম্পত্য জীবনে এক শনিকে ডেকে আনল, যার ফলে তার ও তাব দয়িতার উভযের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। এই ব্যর্থতার করুণ কাহিনীই এই উপন্যাসের উপজীব্য। ১৮৬৫-এ প্রকাশিত 'পূর্বদিন' উপন্যাসে বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তুর্গেনেফ রুশদের প্রকৃত স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন। নায়ক ইনসারফ এবং নায়িকা এলেনা, যে তার প্রণযীকে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিতে নিবৃত্ত করেনি। এই নায়ক নায়িকাকে তুর্গেনেফ খুঁজেছেন রুশিয়ায়। তুর্গেনেফের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পিতাপুত্র' (১৮৬২), যেখানে দুই যুগের দ্বন্দ্ব, পিতা ও পুত্রের দৃষ্টিভঙ্গীব দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। পরবর্তী রচনাগুলি, 'ধোঁয়া' (১৮৬৭) এবং 'অনাবাদী জমি' (১৮৭৭), মুখ্যত রাজনৈতিক উপন্যাস, এবং 'পিতাপুত্রের'-র তুলনায় শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অনেক নিম্নমানের। তুর্গেনেফের রচনার কিছু ত্রুটি সমালোচকেরা আবিষ্কার করেছেন। লেখক হিসাবে তিনি সাহসী ছিলেন না। রচনা ভঙ্গীর মনোহরতা, বাক্-বৈদগ্ধ এবং নির্লিপ্ততা তুর্গেনেফের মস্তবড় গুণ সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজ সচেতন লেখক হিসাবে তাঁর কাছ থেকে যতটা আশা

করা গিয়েছিল তা তিনি পূরণ করেননি।

তুর্গেনেফের বয়োকনিষ্ঠ সমকালীন ফিডর মিখাইলোভিচ ডস্টয়েভ্স্কি (১৮২১-১৮৮১) রুশ সাহিত্যের অপর একজন দিকপাল হিসাবে চিহ্নিত। ভাগ্যবিড়ম্বিত এই লেখকের সমগ্র জীবনটাই একটি নাটক, যা লেখার পরিসর এখানে নেই। ডস্টয়েভস্কির উপর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়, তাঁর মত বিতর্কিত লেখকও সাহিত্যের ইতিহাসে কম জন্মেছেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডস্টয়েভস্কির প্রথম উপন্যাস *The Poor* প্রকাশিত হয় যা নেক্রাসফ প্রমুখ বাস্তব-বাদীদের দ্বারা বিপুলভাবে সংবর্ধিত হযেছিল। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ *The Double* প্রকাশিত হয় ওই বছরেই। ১৮৪৮ সালে নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশার অপরাধে তাঁকে বন্দী করা হয়, এবং তাঁর উপর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে প্রাণদণ্ডের আদেশ বাতিল করে তাঁকে আট বছরের নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়। ১৮৫৬ সালে তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন, এবং একটি সাময়িকপত্রের সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করেন। ১৮৬১তে তাঁব বিখ্যাত উপন্যাস *Insulted and Humiliated* (অবমানিত ও লাঞ্ছিত) প্রকাশিত হয়। বাস্তবধর্মী এই উপন্যাসটির নায়িকা একটি বালিকা যাকে হীন জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে স্বয়ং তার পিতামহ, আর পিতা পৈত্রিক সম্পত্তির লোভে একটি বিবেকহীন জীব বিশেষে পরিণত হয়েছে। সমসাময়িক রুশ ধনীদের জীবনদর্শনই যেন এই রচনায় ফুটে উঠেছে, যেখানে কোন প্রকার মনুষ্যত্ব নেই, আছে শুধু সীমাহীন অর্থলোভ। ওই একই বছরে প্রকাশিত *House of the Dead* (প্রেতপুরী) আসলে তাঁর নির্বাসিত জীবনের কথা, জারের কারাগার যা প্রেতপুরী ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু সেখানকার

বাসিন্দাদের মধ্যে ডস্টয়েভস্কি প্রেত দেখেননি, মানুষই দেখেছেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর *Notes from Underground* যার নায়ক হচ্ছে একজন পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন মেরুদণ্ডহীন মানুষ, যে নিজেও বাঁচতে জানেনা অপরকেও বাঁচতে দিতে জানেনা। বস্তুত এই জাতীয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষই সমাজে সর্বাধিক যাদের লোভ আছে, আকাঙ্খা আছে, কিন্তু তা চরিতার্থ করার মত মনোবল নেই, নারীর প্রতি দুর্বার আকর্ষণ আছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কাপুরুষতাই তাকে গ্রাস করে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় *The Gambler* বা 'জুয়াড়ী' যা তাঁর নিজের জীবন থেকেই সৃষ্টি। ডস্টয়েভস্কি নিজেই ছিলেন জুয়াড়ী, এবং জীবনের একটা পর্যায়ে তিনি জুয়ার নেশায় ডুবে থাকতেন, কপর্দকশূন্য না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিবৃত্ত হতেন না। ওই একই বছরে প্রকাশিত হয় তাঁর *Crime and Punishment*, 'অপরাধ ও শাস্তি', তাঁর শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস, যার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবেই মনস্তাত্ত্বিক। নায়ক রাসকলনিকভ উদ্ধত, জীবন সম্পর্কে তার যে ধারণা তাতে সংস্কারের কোন স্থান নেই, নৈতিক মূল্যবোধ সমূহ তার কাছে যুক্তির বিচারে মূল্যহীন। সে নিজেকে সকল সংস্কার, সকল হৃদয় বিকারের ঊর্ধ্বে মনে করত, এবং তার এই অহংবোধ তৃপ্ত করার জন্যই সে দুটি মেয়েকে খুন করেছিল। কিন্তু অপরাধ সম্পন্ন করার পর সে দেখল যে, নৈতিক মূল্যবোধসমূহ ও হৃদয়াবেগকে অস্বীকার করার জন্য সে এই কাজ করেছে, কাজটা কিন্তু তাকে রেহাই দিচ্ছে না, ভিতরে ভিতরে তাকে উন্মাদ করে তুলছে, হতাশা এবং পাপ-বোধে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে নায়িকা সোনিয়া একেবারে ভিন্ন ধাতে গড়া, তার পিতা তাকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করেছে, কিন্তু তার জন্য তার কোন বিদ্রোহ

নেই, সে সব কিছুকেই মেনে নিয়েছে, তার মধ্যে আছে খৃষ্টীয় বিনম্রতা যা উদ্ধত রাসকলনিকভের জীবনের ধারা, দৃষ্টিভঙ্গী সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন ঘটালো। এ গ্রন্থে ডস্টয়েভস্কি যে জীবন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করেছেন সেই জিজ্ঞাসাকেই তিনি টেনে নিয়ে গেছেন পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত *Idiot* বা নির্বোধ গ্রন্থে তিনি সোনিয়ারই সমধর্মী হিসাবে নায়ক মিশকিনকে কল্পনা করেছেন যে, রোগের যন্ত্রণায় সর্বদাই আত্মমুখী, কিন্তু তার এই আত্মপরায়ণতা তাকে রাসকলনিকভের মত উদ্ধত্ত করেনি, তাকে এক ধরণের অনাসক্তি ও বৈরাগ্য এনে দিয়েছে, তাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত চিত্ত করেছে। যদিও বৈষয়িক ব্যক্তির কাছে সে একটা ইডিয়ট ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত *The Possessed* উপন্যাসে ডস্টয়েভস্কি যারা সমাজে বিপ্লব আনতে চায় তাদের ব্যঙ্গ করেছেন তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদের প্রেক্ষাপটে। শুধু তাই নয় ব্যক্তিগত জীবনে যাঁদের তিনি পছন্দ করতেন না, তাঁদের মসীলিপ্ত চিত্র তিনি এই উপন্যাসে এঁকেছেন। এই সবের ফলে এটি কোন সার্থক সৃষ্টিরূপ শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়নি। ডস্টয়েভস্কির শেষ উপন্যাস *Brothers Karamazov* (১৮৭৯-৮০) তাঁর প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। তিন খণ্ডে পরিকল্পিত এই উপন্যাসের শুধু প্রথম খণ্ডটিই সমাপ্ত হয়েছিল। পাপবোধের উৎস কি, তার নিবৃত্তিই বা কিসে, এই বিশেষ দুটি জিজ্ঞাসা দিয়েই তাঁর যে 'অপরাধ ও শাস্তি' উপন্যাসের সূচনা হয়েছিল, এখানেও সেই একই জিজ্ঞাসা, কারামাজোভ ভাইদের কনিষ্ঠ আলোশ্কির চরিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব পেতে চেয়েছেন। কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু ফীডর একজন ধনী ব্যবসায়ী, কৃপণ, শয়তান ও লম্পট। তার তিন ছেলে, বড় দিমিত্রি, পেশায় অফিসার, বাপের মতই ইন্দ্রিয়া-

সক্ত, কাতেরিনা নামক একটি মহিলার বাগদত্ত, অথচ গ্রুশেংকা নামক এক মেয়েমানুষকে নিয়ে মাতামাতি করে, যার প্রতি নজর আবার তার বুড়ো বাপের আছে। মেজো ছেলে ইৎবান শিক্ষিত যুক্তিবাদী। সে তার বড় ভাই-এর বাগ্দত্তা কাতেরিনাকে ভালবাসে, এবং কাতে-রিনাও তাকে ভালবাসে। তার বিশ্বাস, তাদের পারিবারিক যা কিছু অশান্তি তার জন্য দায়ী তাদেব বৃদ্ধ লম্পট পিতা, যার মৃত্যুই এক-মাত্র সকল অমঙ্গলকে দূর করতে পারে। একথা সে প্রকাশ্যে বলতেও কুণ্ঠিত হত না। ছোট ছেলে আলেক্সি ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বরে সমর্পিত চিত্ত, দীন দুঃখীকে সেবা করে, কোন সাংসারিক ঝামেলায নেই। এ ছাড়া ফীডবের একটি জারজ পুত্র ছিল, যার নাম স্মেরদিয়াকফ। সে মৃগীরোগী, মানসিক যন্ত্রণায অস্থিব, ওই পবিবাবেই সে চাকরের কাজ করে। সম্পত্তিব উত্তরাধিকাব ও ওই গ্রুশেংকা নামক মেয়েটিকে নিযে ফীডরেব সঙ্গে তার বড় ছেলে দিমিত্রিব কলহ, যার পরিণামে ফীডর নিহত হল। বিচারে দিমিত্রি দোষী প্রমাণিত হল, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ তার বিপক্ষে গেল, এবং সে সাইবেরিযায় নির্বাসিত হল। কিন্তু খুন আসলে দিমিত্রি কবেনি, কবেছিল ফীডরের সেই জারজ পুত্র স্মেরিদযাকফ। ইভান সর্বদা বলত তার বাপের মৃত্যু সংসারের পক্ষে মঙ্গল, এবং সেই কথাটা তাব বিপযস্ত মানসিকতায় যে প্রতিক্রিয়াব সৃষ্টি করেছিল তার ফলে সে ফীডরকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করেছিল। ইভানও এই খুনের দাযিত্ব নিজের মনের দিক থেকে এড়াতে পারেনি। আলেক্সি নির্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত তার বড় ভাইকে সাহচর্য দেবার জন্য সাইবেরিয়ায তার সঙ্গী হয়েছিল। আলেক্সির এই আত্মোৎসর্গই রচনার শেষাংশে বড় হয়ে উঠেছে রুশ সাহিত্যে ডস্টয়েভস্কি একটি মহামূল্যবান স্থান অধিকার করে আছেন নিঃসন্দেহে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য

সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তা নিয়ে এখানে আলোচনার সুযোগ কম।

এর পর আসছে রুশ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রাণ পুরুষ লেভ টলস্টয়ের (১৮২৮-১৯১০) কথা। টলস্টয় ছিলেন বহুমুখী সাহিত্যিক, রুশ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যাঁর দানে সমৃদ্ধ। ১৮৫৪-তে লেখা কশাক গল্পটি দিয়েই প্রকৃত পক্ষে তাঁর সাহিত্য জগতে প্রবেশ। এর আগে পরে তিনি অবশ্য কয়েকটি ছোট ও মাঝারি ধরণের রচনায় হাত পাকিয়ে ছিলেন, যথা 'শৈশব', 'বাল্য', 'যৌবন', 'দুই হাজার', 'সুখের সংসার' ইত্যাদি। এগুলি ১৮৫২ থেকে ১৮৫৯ এর মধ্যে রচিত। ১৮৬৪-থেকে ১৮৬৯ এর মধ্যে টলস্টয় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'যুদ্ধ ও শান্তি' (*War And Peace*) উপন্যাস রচনা করেন, যা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে সর্বত্রই আদৃত।

বৃহদায়তন এপিকধর্মী এই উপন্যাসের পটভূমি হচ্ছে নেপোলিয়নের রুশিয়া আক্রমণ, যা ১৮০৫ থেকে ১৮১২ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই সাত বছরের বিস্তৃত রাজনৈতিক ঘটনাবলী রুশ সমাজদেহে যে কি পরিবর্তন এনেছিল, সামাজিক সম্পর্কসমূহ ও আচরণের উপর তার প্রভাব কি রকম হয়েছিল তা দেখানোর জন্য টলস্টয় এই উপন্যাসে তিনটি অভিজাত পরিবারকে, তাদের পারিবারিক ইতিহাসকে বেছে নিয়েছেন। এই তিনটি পরিবারের তিনজন তরুণ তরুণী পিয়ের, আন্দ্রেই ও নাতাশা এই উপন্যাসের তিনটি পৃথক কেন্দ্র, যাদের ঘিরে আবর্তিত হয়েছে সাড়ে পাঁচশোরও বেশি চরিত্র, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যারা প্রত্যেকেই জীবন্ত। ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসগুলির নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত এখানে নেই, কার্যত এই মহাগ্রন্থের কোন সুসংবদ্ধ প্লটও নেই, ঘটনা স্রোত নিজে থেকেই

এগিয়ে গেছে, কখনও সোজা পথ ধরে, কখনও আঁকাবাঁকা পথে, কখনও তা বহুমুখী হয়েছে, আবার কখনও কখনও বিভিন্ন ধারা একত্রিত হয়েছে। টলস্টয়ের ইতিহাসবোধ এবং আদর্শবোধ এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে যে আদর্শের মূল কথা হচ্ছে বাইরের ঘটনার প্রভাবে জীবনে যতই পরিবর্তন আসুক না কেন মানবিক মূল্যবোধগুলি তাতে ভেসে যায় না। এই বক্তব্যটিকেই নিরাড়ম্বর-ভাবে এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। টলস্টয়ের দ্বিতীয় প্রধান উপন্যাস 'অ্যানা কারেনিনা' (রচনাকাল ১৮৭৩-৭৭), যেখানে স্বামী পুত্র সুখে সুখী এক ধনী গৃহবধূর অপ্রকাশিত মানসিক অতৃপ্তির উন্মোচন ঘটিয়েছিল আর একজন প্রণয়-বিলাসী তরুণ, গৃহবধূ অ্যানা যার টানে ঘর ছেড়েছিল, কিন্তু যে অতৃপ্তির প্রেরণায় সে তা করেছিল তার নিবৃত্তি ঘটেনি, তাকে আত্মহত্যা করে রেহাই পেতে হয়েছিল। আর যে তাকে ঘরছাড়া করেছিল, সেও সুখী হয়নি, কিন্তু অ্যানার প্রেমে তার মধ্যেও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটেছিল, তার নীতিবোধ তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মদান করার জন্য। এখানে টলস্টয় দেখিয়েছেন যে ব্যক্তির বিচারক তার নিজস্ব বিবেক ছাড়া আর কেউ নয়, তাই অন্তরের নীতিবোধকে মানুষ কখনওই এড়াতে পারে না। অ্যানা কারেনিনা এবং পরবর্তী প্রধান উপন্যাস 'পুনরুত্থান'-এর রচনাকালের মধ্যে তিনি ছোট বড় অনেকগুলি গল্প, কয়েকটি নাটক, সাহিত্য বিষয়ক ও নিজস্ব মতবাদ সংক্রান্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা লেখেন। সাহিত্য ও শিল্পসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী 'স্বীকারোক্তি' (১৮৭৯) এবং 'শিল্প কি' (১৮৯৭) গ্রন্থদ্বয়ে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর নিজস্ব নৈতিক মতবাদ সংক্রান্ত পুস্তিকাসমূহের মধ্যে 'আমার বিশ্বাস' (১৮৮৪), 'কি কর্তব্য' (১৮৮৬), 'জীবন প্রসঙ্গে' (১৮৮৭), 'ভগবানের রাজত্ব'

(১৮৯৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর অজস্র গল্পসমূহের মধ্যে বিখ্যাত 'মানুষ বাঁচে কিসে' রচিত হয়েছিল ১৮৮২-তে, 'ইভান ইলিচের মৃত্যু', 'পাগোলের স্মৃতিকথা', 'প্রভু ও ভৃত্য' রচিত হয়েছিল ১৮৮৪-তে, 'মানুষের কতটুকু জমি লাগে' ১৮৮৬-তে। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত নাটক 'অন্ধকারের শক্তি' (*Power of Darkness*) গ্রন্থে তিনি মানুষের যৌনমূলক অপরাধ প্রবণতার অতি সুনিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। ১৮৮৯ এ প্রকাশিত 'শিক্ষার ফল' নাটকে তিনি শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব মতবাদ, কৃত্রিম শিক্ষার বদলে প্রকৃতি লব্ধ শিক্ষা প্রকাশ করেন। বলাই বাহুল্য এটি একটি প্রচারধর্মী নাটক। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বড় গল্প ক্রয়েৎসার সোনাটা, একটি ব্যাভিচাবী রমনীর কাহিনী যে শেষ পর্যন্ত তার স্বামী কর্তৃক নিহত হয়েছিল। এই রচনাটিব মধ্যে একটি নেপথ্য মনোবিশ্লেষণী পদ্ধতি আছে যা সচবাচর টলস্টয়ের রচনায় অনুপস্থিত। ১৮৯৭-এ প্রকাশিত হয টলস্টয়ের তৃতীয় বিখ্যাত উপন্যাস *Resurrection* বা পুনরুত্থান। ধনী যুবক নেখলুদভ একটি দাসী কন্যাকে উপভোগ করার পর তাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পরিত্যাগ করে। সেই কিশোরী পরবর্তী জীবনে গণিকায় পরিণত হয় এবং একটি হত্যার অভিযোগে অভিযুক্তা হয। আদালতে ঘটনাচক্রে নেখলুদভ তাকে চিনতে পারে, এবং মেয়েটির এই অধঃপতনের জন্য সে দায়ী, এতদিন পরে তা তার মনে হয়। সে অনুতপ্ত হয, এবং সেই হয় তার পুনর্জীবন। যে অন্যায় সে করেছে তার এখন সে ক্ষতি পূরণ করতে চায়, নিজের অনুতপ্ত হৃদয়ে তাকে গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু করতে চাইলেই তো তা করা যায় না। সে মেয়েটিও তার প্রতি চিরকালের জন্য বিশ্বাস হারিয়েছে, সমাজ ধর্ম কোন কিছুর প্রতিই তার আস্থা নেই, কাজেই আত্মগ্লানির আগুনে আজীবন দগ্ধ হওয়াই

নেখলুদভের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। এই উপন্যাসেও, বলাই বাহুল্য, টলস্টয় তাঁর নিজস্ব নৈতিক মতবাদ উপস্থাপনা করেছেন, তাতে রচনাটির উৎকর্ষের কোন হানি হয়নি। তাঁর শেষ দিককার উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের মধ্যে 'হাজি মুরাদ', 'জাল রসিদ', নীতি গল্প-মালা' প্রভৃতি কথা ও কাহিনী 'জীবন্ত শব' নামক নাটকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টলস্টয়ের যেটা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে এই যে তাঁর শিল্পদৃষ্টি তাঁর মতবাদের দ্বারা নির্ধারিত, তাঁর অধিকাংশ রচনাই তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রকাশের বাহন। যে মতবাদের মূল কথা ব্যক্তিগত নীতিবোধ, অকৃত্রিম জীবন যাত্রা এবং খৃষ্টধর্মানুপ্রাণিত সাম্যসমাজ, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় প্রতিটি রচনাই শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অতুলনীয়। এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণেই যে মানুষকে ও জীবনকে দেখবার চোখ তাঁর ছিল, আর সর্বোপরি ছিল মনুষ্যজাতির উপর গভীর আস্থা, এবং সর্বোপরি সকল ধরণের কৃত্রিমতার প্রতি গভীর বিরাগ।

টলস্টয়ের সমকালীন অপরাপর লেখকদের মধ্যে সালতিকভ-সেচ্‌ড্রিন (১৮২৬-১৮৮৯) ব্যঙ্গমূলক এবং শ্লেষাত্মক রচনার জন্য বিখ্যাত, যাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্যবস্তু ছিল রুশ আমলাতন্ত্র। তিনি নিজেই একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর রচনার জন্য তাঁকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল। এই নির্বাসনের কথা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর 'মফস্বলের চিত্র' (১৮৫৬-৫৭) গ্রন্থে। আমলাতন্ত্রকে বিদ্রূপ করে তিনি যা লিখেছিলেন তা হচ্ছে, 'পম্পাডুর ও পম্পাডুর পত্নী', 'তাসখন্দী', 'একটি শহরের দুর্দশা, 'মধ্যপন্থা ও শৃঙ্খলার রাজত্ব' 'পরী কাহিনী' ইত্যাদি যেগুলি রচিত হয়েছিল ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ মধ্যে। এছাড়া তিনি আরও দুখানি উপন্যাস লিখেছিলেন, 'গলভ্‌লেভ গোষ্ঠী' (১৮৮০) এবং 'পসথনিকের ইতিবৃত্ত' (১৮৮৭),

প্রথমটি একটি ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত পরিবারের কথা, দ্বিতীয়টি একটি আত্মকথামূলক বৃত্তান্ত। পরবর্তী লেখক উসপেনস্কি (১৮৪৩-১৯০২) বাস্তবধর্মী ছিলেন, কৃষক জীবনের দুর্দশাময় চিত্র তিনি তাঁর রচনায় সার্থকভাবে ফোটাতে পেরেছিলেন। ১৮৮৫ তে প্রকাশিত 'আমার পরিচালিকা' উপন্যাসে তিনি একজন দরিদ্র শিক্ষকের জীবনের স্বপ্ন ফুটিয়ে তুলেছিলেন। টলস্টয়ের সমকালীন অপরাপর লেখকদের মধ্যে নিকোলাই লেসকভের (১৮৩১-৯৫) 'গীর্জার মানুষ' (১৮৭২) এবং 'জাদুগ্রস্তের ভ্রমণ কাহিনী' (১৮৭৩) উপন্যাস দুটি উল্লেখযোগ্য। প্রথম উপন্যাসটিতে একটি ছোট শহরের গীর্জার এক নিম্ন পদস্থ পাদ্রীর চিত্র আঁকা হয়েছে যে বহু প্রলোভন, ভীতি ও কৌশলের দাবি এড়িয়ে নিজের জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চায়। দ্বিতীয় উপন্যাস এক পলাতক ভূমিদাসের কাহিনী যে প্রভুর নাগাল·ছাড়িয়ে চলেছে তীর্থযাত্রায়, পথে বিচিত্র সব চরিত্রের সঙ্গে তার পরিচয় কথোপকথন, নাটকীয় ঘটনারও অভাব নেই, কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় উপন্যাসটির বর্ণনামূলক দিকগুলি। লেসকভ আরও বহু লিখেছিলেন, তাঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যে কয়েকটি নাট্যরূপও পেয়েছিল। টলস্টয়ের আরও একজন বয়োকনিষ্ঠ সমকালীন গারশিন (১৮৫৫-১৮৮৮) গল্পকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ চারটি দশক বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক ভাবধারা ও কার্যকলাপের বিকাশের কাল হিসাবে রুশিয়ায় চিহ্নিত। রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র, গীর্জার প্রাধান্য ও উগ্র শ্লাভ জাতীয়তাবাদকে সুদৃঢ় করার দায়িত্ব যে সব বুদ্ধিজীবিরা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে লিওনাতিয়েভ, স্ত্রাখোভ, দানিলেভস্কি, কাৎকভ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে বিপ্লবী আদর্শের প্রচার করেছিলেন

লাভরভ (ইনি মীরভ ছদ্মনামে প্রসিদ্ধ), ক্রপটকিন প্রভৃতিরা। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবধারা যাঁরা ক্রমে ক্রমে রাশিয়ায় নিয়ে আসছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিকোলাই মিখাইলভস্কি (১৮৪২-১৯০৪) এবং জর্জ প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯৪৮)। প্রথম জনের বক্তব্য ছিল কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবি এই তিন শ্রেণীর সমন্বয়ে সমাজবিপ্লব আনতে হবে। প্লেখানভ পুরোদস্তুর মার্কসবাদীতে পরিণত হয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষ চার দশকের এই জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন ছোট গল্পের যাদুকর আন্তন চেকভ, যাঁর তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। চেকভ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬০ সালে একটি দরিদ্র পরিবারে। অভাবের তাড়নায় তিনি প্রথম যৌবনে হাসির গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতে থাকেন, ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৬র মধ্যে তিনি শ'চারেকের বেশি গল্প লিখেছিলেন, অথচ সাহিত্যিক তিনি হতে চাননি; চেয়েছিলেন লিখে উপার্জন করে ডাক্তারি পড়তে, এবং তা তিনি করেও ছিলেন। তবু ঘটনাচক্রে তিনি লেখকই হয়ে পড়লেন. রচনায় বুদ্ধির দীপ্তি, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, ভাষায় ব্যঙ্গের আড়ালে চাবুকের ধার এবং একই সঙ্গে অদৃশ্য অশ্রু, আপনিই ফুটে উঠল, ১৮৮৫ সাল থেকেই চেকভ সচেতন লেখকে পরিণত হলেন। তাঁর গল্পগুলিতে আশ্চর্যভাবে সমকালীন জীবনের জটিলতার, বেদনার ও নিরাশার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর প্রথম পর্বের গল্পগুলিতে চেকভ অভিজাত শ্রেণী ও আমলাতন্ত্রকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছেন, বুদ্ধিজীবিদের মেরুদণ্ডহীন জীবন, আদর্শহীনতা সুবিধাবাদ সমস্ত কিছুকেই তিনি সুনিপুণ ব্যঙ্গের আড়ালে চিত্রিত করেছেন। ১৮৮৩ সালে লেখা 'কেরাণীর মৃত্যু' গল্পটিকে নিছক ব্যঙ্গ কাহিনী বলা চলে না নিশ্চয়ই। রাজনৈতিক উগ্র পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠলেও চেকভ একদিকে

ছিলেন নিস্পৃহ ও উদাসীন, কিন্তু তাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাংকা গল্পটিতে চেকভ মাতৃপিতৃহীন একটি বালকের যে অসহায়তার ও ট্রাজেডির চিত্র এঁকেছেন, তা তো সর্বজগতের হতভাগ্য শিশুদের প্রতিচ্ছবি। 'দুর্ভাগা' 'খিন্ন হৃদয়' প্রভৃতির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'ভানিয়া খুড়ো' মানসাদের বাড়ি', 'নামহীন মানুষ' প্রভৃতি গল্পে চেকভ একেবারে স্বচ্ছ, পুরোদস্তুর বাস্তববাদী অথচ সীমাহীন মানবপ্রেমিক। গল্পের পাশাপাশি চেকভ ছোট ছোট নাটক লিখেছেন, একাংক নাটিকা ও স্বগতোক্তি (মনোলগ), তবে সেগুলি জনপ্রিয় হয়নি। পরবর্তীকালে তাঁর যে তিনখানি নাটক জনপ্রিয় হয়েছে সেগুলির নাম 'তিন বোন' (১৯০০), 'চেরি বাগিচা' (১৯০৩) ও 'চাইকা' (১৯০৪)। তিন বোন নাটকটি গ্রামে বসবাসকারী তিনটি বোনের একঘেয়ে জীবনযাত্রা থেকে নিস্কৃতিলাভের স্বপ্ন, চেরি বাগিচা নাটকের বিষয়বস্তু জমিদার শ্রেনীর পতন ও পুঁজিবাদী শ্রেনীর অভ্যুত্থান, আর চাইকা নাটকটি হ্যামলেটের এক আধুনিক ও জটিল সংস্করণ। ১৮৮৭-৮৮ র মধ্যে চেকভ তাঁর বিখ্যাত 'স্তেপে' নামক বড় গল্প ও আরও কয়েকটি ছোট গল্প প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ তে তিনি রাজকীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির পুশকিন পুরস্কার পান, কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি ক্ষয়রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই বছরেই তিনি শাখালিন দ্বীপ পরিদর্শন করেন যা তাঁর বিখ্যাত কাহিনী ছয় নম্বর ওয়ার্ড এর উৎস। তাঁর শাখালিনে ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও তিনি রুশকায়া মিশল পত্রে ধারাবাহিক ভাবে লিখেছিলেন। তাঁর দুশেচকা বা প্রিয়তমা (১৮৯৯) গল্পটিকে টলস্টয় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পরূপে উল্লেখ করেছেন। ১৯০২ সালে চেকভ বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য হন, কিন্তু গোর্কির সদস্যপদ নামঞ্জুর

হয়ে যাবার প্রতিবাদে তিনি রাজানুগ্রহ পরিত্যাগ করেন। তাঁর অপরাপর বিখ্যাত গল্পসমূহের মধ্যে ইউনুস, কুকুর সঙ্গিনী, ভদ্রমহিলা, আলো, দ্বন্দ্ব, ভলোদিয়া, প্রজাপতি, প্রতিযোগী, পাত্রী প্রভৃতি বিখ্যাত। তাঁর শেষ গল্পটির নাম 'পাত্রী'। চেকভের প্রতিটি গল্পই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। চেকভ শান্ত, গভীর, কিন্তু জীবন সম্পর্কে নিরাশাবাদী নন। তাঁর রচনায় ক্লাইম্যাক্স নেই, নাটকীয়ত্ব নেই, চমক নেই, এখানেই মোপাসাঁর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির সঙ্গে চেকভের রচনার সাদৃশ্য চোখে পড়ে। গল্প যে কোন জায়গা থেকে আরম্ভ হতে পারে, যে কোন জায়গায় তার শেষও হতে পারে, কিন্তু এই শেষের একটা সমগ্রতা আছে, সব মিলিয়ে একটা কিছু কথা বলার আছে যা পাঠক নিজের অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করবে, নিজের অজ্ঞাতেই তার একটি দীর্ঘশ্বাস নেমে আসবে, এখানেই চেকভের বিশেষ কৃতিত্ব।

১৯০৪ সালে চেকভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রুশ সাহিত্য থেকে উনিশ শতক বিদায় নিল। অবশ্য টলস্টয় আরও ক'বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু তিনিও উনিশ শতকের লেখক, ওই সময়টাই তাঁর বিকাশ ও বৃদ্ধির কাল। তুর্গেনেভ, ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয় ও চেকভের পর বিশ শতকের প্রারম্ভে রুশ সাহিত্যে অবক্ষয়ের পালা নেমে আসে। কিন্তু এ শূন্যতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি, গোর্কি তা অনায়াসেই পূরণ করতে পেরেছিলেন। আমরা উনিশ শতকেই রুশ সাহিত্যের আদিপর্বের ছেদ টানছি।

॥ ইউক্রানীয় সাহিত্য ॥

ইউক্রানীয় প্রজাতন্ত্র দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর, পশ্চিমে রুমানিয়া, মোলডাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোলাণ্ড, উত্তরে বাইলো-রুশিয়া, এবং উত্তর-পূর্বে ও পূর্বে রুশীয় যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা বেষ্টিত। ইউক্রানীয় বা ক্ষুদ্র রুশ ভাষা পূর্বশ্লাভীয় পরিবারের তিনটি ভাষার একটি, অপর দুটি হল বৃহৎ-রুশ, যা রুশীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভাষা, এবং শ্বেত রুশ যা বাইলোরুশিয়ার ভাষা। বৃহৎ-রুশ ভাষার মত ক্ষুদ্র রুশ বা ইউক্রানীয় ভাষাও বলকান অঞ্চলের চার্চ শ্লাভনিক ভাষারই একটি বিবর্তিত ও সংমিশ্রিত রূপ হিসাবেই গড়ে ওঠে। কিন্তু চার্চ শ্লাভনিককে বর্জন করতে বৃহৎ-রুশ ভাষার যে সময় লেগেছিল, তার চেয়েও অল্প সময়ে ইউক্রানীয় ভাষা স্বাবলম্বী হয়েছিল। সোভিয়েট দেশের সাড়ে তিন কোটিরও অধিক লোক ইউক্রানীয় ভাষায় কথা বলেন, এছাড়া জগতের অন্যত্র এক কোটির অধিক লোক এই ভাষায় কথা বলে থাকেন। ইউক্রানীয় ভাষাও রুশ ভাষার মত সিরিলীয় হরফে লিখিত হয়, তবে কয়েকটি অক্ষরের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে।

আদিপর্যায়ে বৃহৎ-রুশ এবং ইউক্রানীয় সাহিত্য অভিন্ন, বরং বলা যায় যে বৃহৎ-রুশ সাহিত্যের ঐতিহ্য ইউক্রানীয় প্রাচীন সাহিত্যকে অবলম্বন করে বৃদ্ধি পেতে চেয়েছে। বৃহৎ-রুশ সাহিত্যের যে যুগটিকে বলা হয় কিয়েভীয় যুগ তা একান্তভাবেই ইউক্রানীয় সাহিত্যের নিজস্ব। নেস্টর রচিত ক্রনিকল্স এবং কিয়েভে রচিত কয়েকটি ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র দিয়েই প্রকৃতপক্ষে ইউক্রানীয়

সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছিল। একাদশ শতকে কিয়েভের মেট্রোপলিটান ইলারিয়ন রচিত “আইন ও নীতি সংক্রান্ত আলোচনা” (*Slovo O Zakone i Blagodati*) এবং দ্বাদশ শতকে সম্রাট ভ্‌লাদিমির মনোমাখ রচিত “উপদেশ সমূহ” (*Pouchenie*) ইউক্রানীয় সাহিত্যের প্রথম যুগের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস, যেগুলি আমরা রুশ সাহিত্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। এছাড়া পূর্বোল্লিখিত “অতীত যুগের কাহিনী”, বোরিস ও গ্লেবের আখ্যান, ঐতিহাসিক গাথাসমূহ, বিশেষ করে ইগোর-গাথা প্রাচীন ইউক্রানীয় সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। অ্যাবট দানাইলো বিরচিত “তীর্থযাত্রা” দ্বাদশ শতকের ইউক্রানীয় সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকেই কিয়েভে একের পর এক মঙ্গোল আক্রমণ চলে, এবং ১২৪০ খৃষ্টাব্দে কিয়েভ মঙ্গোলগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। এ যুগের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ঘটনাবলী যে গ্রন্থে রক্ষিত হয়েছে তা *Galician Volhynian Chronicle* (১২০৫-৯২) নামে পরিচিত। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ইউক্রানীয় সাহিত্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতকের মধ্য থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্য পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রকৃত অর্থে ইউক্রানীয় সাহিত্য একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। রুশ দেশীয় মুদ্রক ইভান ফেডোরোভের চেষ্টায় ইউক্রেনে পুস্তক মুদ্রণের শুরু হয় ১৫৭৪ থেকে। ধর্মশাস্ত্র সমূহের অনুবাদের কাজ চলতে থাকে, এবং ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে বাইবেলের একটি বিশেষ সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়।

পাশাপাশি লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য ইউক্রানীয় সাহিত্যের বিকাশের উপর একটি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। অপরাপর

দেশের মত এই লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য ছিল মূলত মৌখিক, যদিও ষোড়শ শতকের পর থেকে তার কিয়দংশ লিখিত আকার পেতে শুরু করেছিল। ইউক্রাইনীয় গ্রাম্য জীবন, বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান, এবং কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ছিল এগুলির বিষয় বস্তু। লোক-সঙ্গীতসমূহকে বলা হত *duma* বা *dumy*. পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে রচিত বহু লোক-সঙ্গীত তুর্কী ও তাতার আক্রমণের বিরুদ্ধে, পোল অভিযানের বিরুদ্ধে, ইউক্রাইনীয় জনগণের সংগ্রামের কাহিনী পাওয়া যায়, খ.সেলিনিৎস্কি, ক্রিভোনিস, নেকাই, মোরোশেংকো প্রভৃতি জাতীয় বীরগণের উদ্দেশ্যে সেগুলি রচিত। এই সকল লোক-সঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য 'বিব্রত ইউক্রেন', 'নদীর ওপারে আগুন জ্বলছে', 'কশাক হোলোতা', 'ওতামান মাতিয়াশ বুড়ো হয়ে গেছে,' 'নীপার দানি-য়ুবের সঙ্গে কথা কয়', 'ইভাস ওভোভিচেংকো কোনোভচেংকো', 'আজভ থেকে তিন ভাই-এর পলায়ন', 'সামিইলো কিসকা' প্রভৃতি। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের কৃষক বিদ্রোহগুলিকে কেন্দ্র করেও অনেক *duma* রচিত হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে ম্যাকসিম সাক্লিৎসনিয়াক, ইভান গোণ্টা, ওলেক্সা দোভবুশ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত সঙ্গীতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইউক্রাইনীয় গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত মূলত খৃষ্টধর্মকে অবলম্বন করে। ইউরোপের অপরাপর দেশের মত রেনেসাঁসের প্রভাব ইউক্রেনেও পড়েছিল, যার ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় ভাষায় ধর্মশাস্ত্রসমূহ রচনা ও অনুবাদের প্রয়াস দেখা গিয়েছিল, অপর-দিকে তেমনই সংস্কারবাদী আন্দোলনসমূহ প্রবর্তিত হওয়ায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শগত সংঘাত শুরু হয়েছিল। স্বাভাবিক-ভাবেই সাহিত্য এই সংঘাতের বাহন হয়ে দাঁড়ায়। যে সব লেখক-

বৃন্দ তাঁদের সম্প্রদায়গত বক্তব্যের উপর জোর দিয়ে বিপক্ষদের মতবাদসমূহ উৎসাদনের জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্মোত্রিসস্কি, সিসানি, কিজরাইক অস্ট্রোৎস্কি, ফিলালেৎ, বোবেৎস্কি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল লেখকদের মধ্যে যিনি বিশেষভাবে উল্লিখিত হবার দাবি রাখেন তিনি হচ্ছেন ইভান ভিসেনস্কি (মৃত্যু ১৬২৫) যিনি তাঁর রচনাসমূহে নিজেকে শুধু ধর্মতত্ত্বের এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, সমসাময়িক সামাজিক অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেও বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন। উপরি উক্ত লেখকদের বাদ-প্রতিবাদ সংক্রান্ত রচনাগুলি সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে সংকলিত রুশ *Kirilovaya Kniga* গ্রন্থে উক্ত লেখকদের কিছু কিছু রচনার অন্তর্ভুক্তিতে।

অনূদিত ধর্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে *Peresopnik Gospel* (১৫৫৬-১৫৬১) ও নেহালেভস্কির বাইবেল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধর্মযাজকদের দ্বারা ইউক্রানীয় সাহিত্যের আদি পর্যায়টি প্রবর্তিত হলেও, পরবর্তীকালে শিক্ষক-ছাত্রদের হাতে তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সকল গ্রন্থ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল সেগুলির ইংরাজী নামগুলি এখানে উল্লেখ করছি : রিমশা রচিত *Chronology* (১৫৮২), লিবিভ বিত্থালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সংকলিত ***Prosphonema*** (১৫৯১), মিতুরা রচিত ***Pletenetsky's Pattern of Virtue*** (১৬১৮), সাকোভিচ রচিত ***Verses on the Mournful Funeral of P. Sahaidachny*** (১৬২২), কিয়েভ কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক সংকলিত ***Eucharistirion*** (১৬৩২) এবং ***Euphonia of Glad Sounds*** (১৬৩৩) এবং জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের ***Lament of Ostrog*** (১৬৩৬)।

এই সকল রচনাগুলির উপর কিছু কিছু ধর্মীয় প্রভাব থাকলেও, সপ্তদশ শতক থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষণ ইউক্রানীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে কিয়েভের মেট্রোপলিটান পেট্রো-মোহাইলা (১৫৯৬-১৬৪৭) একটি অ্যাকাডেমির সৃষ্টি করেন যা সাহিত্যচর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউক্রানীয় কবিতা ও নাটকের ক্ষেত্রে অজ্ঞাতনামা লেখকেরাই প্রভুত্ব করেছেন। ১৬৪৮ থেকে ১৬৫৪ ছিল ইউক্রেনের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের কাল। রুশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের সংযুক্তি ইউক্রানীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি নূতন যুগের সূত্রপাত করেছিল। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে রুশ ও ইউক্রানীয়দের যুগ্ম প্রতিরোধের ঘটনা উভয় সাহিত্যকেই প্রভাবিত করেছিল, এবং এই ধরণের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে 'ক্ষুদ্র রুশিয়ার ক্রন্দন' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল যেগুলি জনগণকে যেমন একদিকে বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেছে, অপরদিকে তেমনই জমিদার শ্রেণীর জাতীয়তা বিরোধী কাজকর্মের মুখোস উন্মোচন করেছে। এই যুগের কবিদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ক্লিমেন্তি এবং বেলিচকোভস্কি, এবং গদ্য লেখকদের মধ্যে স্টাভ্রোভেৎস্কি, বারানোভিচ, হালিয়াতোভস্কি, রাদিভিলোভস্কি প্রভৃতি, সমসাময়িক ঘটনাবলী যাঁদের রচনার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। সপ্তদশ শতকের ইউক্রানীয় নাটক গীর্জার প্রভাব এড়াতে পারেনি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমসাময়িক জীবনের লক্ষণ সংক্রামিত হয়েছিল। আদি ইউক্রানীয় নাট্যকার হাভাভোভিচের রচনায় কিছু কিছু বাস্তবতার স্পর্শ ছিল, এবং এই ঐতিহ্যই কালক্রমে প্রাধান্য পেয়েছে 'ঈশ্বরের মানুষ, আলেকসি' (১৬৭৩) প্রভৃতি নাটকে।

সপ্তদশ শতকের অপরাপর বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে রম্যকাহিনী লেখক দোভালেভস্কি এবং সন্তজীবনী লেখক দিমিত্রো তুপতালোর (১৬৫১-১৭০৯) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আন্দ্রেলা রচিত 'লোগোস' (১৬৯১-৯২) এবং 'প্রকৃত বিশ্বাসীর আত্মরক্ষা' (১৬৯৯-১৭০১) ধর্মীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি।

ইউক্রানীয় সাহিত্যে অষ্টাদশ শতকের সূত্রপাত কয়েকটি ইতিহাস গ্রন্থ দিয়ে যেগুলিতে সমসাময়িক কালের ঘটনাবলী বিধৃত হয়েছে সামোভিডেট (১৭০২), হ্রাবিয়াংকো (১৭১০) এবং বেলিচকো (১৭২০)-র গ্রন্থসমূহে। ইউরোপীয় সাহিত্যের ইউক্রানীয় অনুবাদের প্রচেষ্টাও এই সময়ে দেখা যায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের ইউক্রানীয় সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়েছে অধ্যাত্মবাদ ও খৃষ্টীয় সাহিত্যের বিরুদ্ধে বাস্তববাদের বিজয় লাভ। নাটকের ক্ষেত্রে এই বাস্তববাদের প্রবর্তন করেন থিওফান প্রোকোপোভিচ (১৬৮১-১৭৩৬) যিনি ছিলেন সম্রাট প্রথম পিটারের দার্শনিক উপদেষ্টা। তাঁর নাটক 'বোলোদিমির' (১৭০৫) কিয়েভের রাজকুমার ভ্‌লাদিমিরের জীবন অবলম্বনে রচিত যিনি সামাজিক কুসংস্কার ও পুরোহিত তন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম করে ছিলেন। 'বিধাতার করুণায় বোগদান সিনোভিখ্‌ মেলনিৎস্কির প্রচেষ্টায় মুক্ত ইউক্রেন' নামক একটি নাটকের (১৭২৮) কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য, ইউক্রেনের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রুশিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির পটভূমিকায় যা রচিত। নাট্যকারের নাম অজ্ঞাত। অপরাপর যে সকল লেখক অষ্টাদশ শতকে বাস্তবতার অনুসরণকারী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্লিমোভস্কি, নেক্রাসেভিচ, এবং বিশেষ করে স্কোবোরোদা উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই রুশ সাহিত্যের বাস্তববাদী লেখকদের দ্বারা, বিশেষ করে

কাস্তেমির, নোভিকভ, রাডিচেভ, কাপনিস্ট প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ত্রেদিয়াকোভস্কি, লোমোনোসোভ প্রমুখ রুশ পণ্ডিতবর্গের ভাষা বিষয়ক কাজকর্ম তাঁদের রচনাশৈলী ও ভাষার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। হ্রিহোরি (গ্রিগোরি) স্কাবোরোদা (১৭২২-৯৪) ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ইউক্রানীয় সাহিত্যের সবচেয়ে বড় প্রতিভা যিনি ছিলেন একধারে কবি, গল্পকার ও দার্শনিক। তাঁর দার্শনিক রচনাসমূহের মধ্যে 'প্রাচীন জগত সংক্রান্ত কথোপকথন', 'প্রকৃত সুখ', প্রভৃতি এবং অপরাপর সাহিত্য কর্মের মধ্যে 'স্বর্গীয় সঙ্গীতের উদ্যান', 'খারকিভ গল্পমালা' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্কাবোরোদা প্রগতি পন্থী লেখক ছিলেন, সামাজিক অসাম্য এবং গীর্জার ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার।

উনিশ শতক থেকে ইউক্রানীয় সাহিত্যে বহুমুখী পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটান ইভান কোৎলিয়ারেভস্কি (১৭৬৯-১৮৩২) যিনি তাঁর 'ইনিড' (১৭৯৮) ও 'নাটাল্‌কা পোলটাভকা' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের জন্য বিখ্যাত। উভয় রচনাতেই সমসাময়িক ইউক্রেনের বাস্তব দুরবস্থার চিত্র যেমন নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে, অপর দিকে তেমনই ইউক্রানীয় ঐতিহ্যের উপরও সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ; ইউক্রানীয় লোকসাহিত্যেরও সুনিপুণ ব্যবহার গ্রন্থদ্বয়ে করা হয়েছে। কাব্যাদর্শের ক্ষেত্রে যাঁরা কোৎলিয়ারেভস্কিকে অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হুলাফ-আর্টেমোভস্কি, বোরোভিকোভস্কি, হ্রেবিংকা, বিলেৎস্কি-নোশেংকো, কোরোস্তিৎস্কি, আলেকসান্দ্রোভ, দুমিত্রাস্কো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য যাঁদের রচনায় ইউক্রানীয় লোকসাহিত্য প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮০৫ সালে খারকিভ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা অচিরে সাহিত্য চর্চার একটি বড় কেন্দ্র হয়ে

ওঠে। এখান থেকে তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হত, 'ইউক্রাইনস্কি ভেস্তনিক', 'খারকোভস্কি দেমোক্রিত' এবং 'ইউক্রাইনস্কি ঝুর্ণাল'। মস্কো এবং সেণ্টপিটার্সবার্গ থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা সমূহেও ইউক্রানীয় লেখকদের রচনা প্রকাশিত হত। খারকিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত লেখকমণ্ডলী ইউক্রানীয় সাহিত্যে রোমান্টিকতার সূত্রপাত ঘটান। এই রোমান্টিক ভাবধারার জাগরণের কয়েকটি কারণ ছিল। জেরটেলেভ এবং মাকসিমোভিচ এর নৃতাত্ত্বিক গবেষণাসমূহ, বাণ্টাইশ-কামেনস্কি রচিত ইউক্রেনের ইতিহাস, স্রেৎনেভস্কি প্রমুখের রচনায় প্রতিফলিত ইতিহাস ও লোকযান সম্পর্কে আগ্রহ, রোমান্টিক কবিদের বিশেষ প্রেরণা দিয়েছিল যাঁদের মধ্যে মেৎলিনস্কি (১৮১৪-৭০), কোস্তোমারোভ (১৮১৭-৮৫), ৎসাবিলা, পেত্রেংকো, আফানাসিয়েভ-চুৎবিনস্কি, স্কোহোলেভ, পিসারেভস্কি, পূর্বোল্লিখিত বোরোভিকোভস্কি এবং ত্রেবিংকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনাবলী প্রকাশিত হত 'ইউক্রাইনস্কি আলমানাখ', 'ইউট্রেনায়া ৎসভেসদা', 'লাস্তিভকা', 'স্নিপ', 'মোলোডিক' 'ইউৎসনি রুশকী ৎসবোরনিক' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা ও সংকলনে।

ইউক্রানীয় সাহিত্যের রোমান্টিকতা কালক্রমে রক্ষণশীল ও বৈপ্লবিক এই দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম ধারাটির প্রতিনিধি ছিলেন পান্তেলেইমন কুলিশ (১৮১৯-৯৭) যিনি ছিলেন একাধারে বাইবেলের অনুবাদক, শেকসপীয়ারের অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও কবি। দ্বিতীয় ধারাটির প্রতিনিধি ছিলেন তারাস শেভচেংকো (১৮১৪-৬১) যাঁর কথা আমরা পরে উল্লেখ করব। মাকারোভস্কির কবিতায় এবং কৃভিৎকা-ওস্নো-ভিয়ানেংকোর নাটক সমূহে আবেগধর্মিতার প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়।

রোমান্টিক নাট্যকারদের মধ্যে হোহোল, কুখারেংকো ও তোপোলিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পূর্বোক্ত লেখকদের মধ্যে কোৎলিয়ারেভস্কি, কোস্তোমারোভ, পিসারেভস্কি প্রমুখেরাও নাটক রচনা করেছিলেন। সমসাময়িক রুশ সাহিত্য, বিশেষ করে পুশকিন, লেরমোন্তোভ ও গোগোলের (ইনি ইউক্রানীয় ছিলেন) ইউক্রানীয় সাহিত্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং উপরি উক্ত লেখকদের অনেকেই রুশ ভাষাতেও লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন। পশ্চিম ইউক্রেনে (গালিসিয়া, বুকোভিনা ও ট্রান্সকার্পাথিয়া অঞ্চল) সাসকেভিচ, হোলোভাৎস্কি এবং ভাহিলেভিচ প্রচলিত লোকচর্যা অবলম্বনে একত্রে রচনা করেছিলেন 'নিস্টার জলপরী' (১৮৩৭)।

কিন্তু উনিশ শতকের ইউক্রানীয় সাহিত্যে যিনি গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করেন তিনি হচ্ছেন তারাস শেভচেংকো। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি শুধু বিপ্লবই আনেননি, ইউক্রানীয় স্বাতন্ত্রেরও তিনি ছিলেন প্রবক্তা। একাধারে কবি, চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীত বিশারদ এই প্রতিভার জন্ম ভূমিদাসের ঘরে। তাঁর সাতচল্লিশ বছরের জীবনের প্রথম আঠাশ বছর কেটেছে দাস হিসাবে, রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনি দশ বছর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেছিলেন। রুশিয়ার জারতন্ত্রের দমননীতির বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করেছেন, সর্বত্রই তিনি নিপীড়িত মানবতার স্বপক্ষে তাঁর সাহিত্যকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর বহু রচনা অবশ্য সরকারী সেন্সর ব্যবস্থায় প্রকাশিত হবার সুযোগ পায়নি। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা সংকলন 'কোবৎসার' এবং পরবৎসর তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'হাইডামাকি'। এ ছাড়া আরও বহু রচনায় তিনি ইউক্রানীয় সাহিত্যকে মূল্যবান ভাবসমূহ এবং প্রগতিশীল সামাজিক আদর্শ সমূহের বাহন হবার উপযুক্ত

করেছিলেন। শেভচেংকো রুশ ভাষাতেও কবিতা, নাটক (নিকিতা গাইদাই) উপন্যাস ও একটি দিনলিপি রচনা করেছিলেন। বিপ্লবের স্বপক্ষে তিনি অস্ত্র ধারণও করেছিলেন। শেভচেংকোকে ইউক্রানীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রবক্তা বলা হয় এই কারণে যে তদানীন্তন রুশ সরকার ইউক্রানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি উচ্ছেদের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে একটি আইন দ্বারা ক্ষুদ্র রুশ ভাষার (ইউক্রানীয়) অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, ওই ভাষায় গ্রন্থাদি প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কুখ্যাত এমস এডিকটের দ্বারা ইউক্রানীয় সাহিত্যের ক্ষেত্র বিশেষভাবে সংকুচিত করেন।

কিন্তু এই প্রতিকূল পরিবেশেও ইউক্রানীয় সাহিত্যের বিকাশ ব্যাহত হয়নি। বিলোসেবস্কি সম্পাদিত 'ওসনোভা' (১৮৬১-৬২) পত্রিকা শেভচেংকো-অনুসারী লেখকদের রচনা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিল। এইসব লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভোভচোক, হ্লিবোভ, রুদানস্কি প্রভৃতি। গালিসীয় সাময়িক পত্রগুলিও এই সময় ইউক্রানীয় সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। এগুলি ছিল ভেচেরনিৎসি', 'মেতা', 'নিভা' 'প্রাভদা' 'ৎসোরিয়া', স্বিট', ইত্যাদি। শেভচেংকোর ভাবধারা সমূহকে যিনি বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সাহিত্যকে আরও বাস্তবভিত্তিক করেছিলেন, তিনি ছিলেন লেখিকা মার্কো ভোভচোক (১৮৩৪-১৯০৪), যাঁর 'জনগণের কাহিনীসমূহ' (১৮৮৭) ইউক্রানীয় সাহিত্যের একটি অনবদ্য সৃষ্টি, যেখানে লেখিকা তৎকালীন ভূমিদাস প্রথা এবং বিশেষ করে নারীজাতির দুঃসহ অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি ইউক্রানীয় এবং রুশ উভয় ভাষাতেই রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং

তাঁর পরবর্তী রচনাসমূহে তিনি শেভচেংকো, হের্ৎসেন ও তুর্গেনেভের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছিলেন। অপর একজন গদ্যলেখক স্বিদনিৎস্কি তাঁর *Lyuboratski* গ্রন্থে তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস *Chorna Rada*-য় তিনি সপ্তদশ শতকের সামাজিক সংঘাত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। হান্না বারভিনোক কৃষক পরিবারের জীবন অবলম্বনে উপন্যাস লিখেছিলেন। অপরাপর ঔপন্যাসিক ও গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্টোরোঝেংকো, মোর্দোভেৎস, আলেকসান্দ্রোভিচ, নোমিস এবং নিস। শেভচেংকো-পরবর্তী বাস্তবধর্মী গদ্য লেখকদের মধ্যে আরও যাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন নেচুই-লেভিৎস্কি, পানাস মির্নি প্রভৃতি। লেভিৎস্কি তাঁর *Mykola Dzherya, Burlachka, Clouds*, প্রভৃতি রচনায় ইউক্রানীয় সমাজ জীবনকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। পানাস মির্নির রচনায় ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনকারী যোদ্ধাদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ইভান বিলিকের সঙ্গে যুক্তভাবে রচিত 'গামলা যখন পূর্ণ থাকে তখন কি গরু ডাকে' উপন্যাসে তিনি সামন্ত যুগীয় সমাজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর অপর উপন্যাস *Wanton*-এ তিনি গ্রাম্য জমিদার ও ভূস্বামীদের জনবিরোধী ভূমিকার মুখোস উন্মোচন করেন। তাঁর রচনাসমূহে টলস্টয়ের কিছু প্রভাব আছে।

কবিতা ও কাব্যের ক্ষেত্রে শেভচেংকো-পরবর্তীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্চোগোলেভ, কোনিস্কি, কুলিক, চুঝবিনস্কি প্রভৃতি। স্তেপান রুদানস্কি তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ঝড়, তুমি ইউক্রেনে বও'-এর জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ, এবং তাঁর ছোট ছোট ব্যঙ্গমূলক কবিতা (*Spivomovkas*) তাঁকে বিশেষ জনপ্রিয় করেছিল।

এছাড়া তিনি ইগোর গাথা ও হোমারের ইলিয়াডের অনুবাদ করেছিলেন। মিখাইলো স্তারিৎস্কি কবিতার ক্ষেত্রে বিখ্যাত রুশ কবি নেক্রাসফকে অনুসরণ করেছিলেন। হ্লিবোভ সঙ্গীত ও আখ্যান কাব্যের জন্য বিখ্যাত, এবং শিশুদের জন্য তাঁর রচিত কবিতাবলী ইউক্রানীয় সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ইভান মানঝুরা তাঁর *Steppe Dumes and Songs* সংকলনে দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর জীবন যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন। পাবলো হ্রাবোভস্কি তাঁর 'তুষারপাত', 'উত্তর থেকে' এবং 'কোবৎসা' সংকলনত্রয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। অনুবাদক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। নিসচিনস্কি হোমারের অডিসির অনুবাদ করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষে দিকের অপরাপর কবিদের মধ্যে নাভ্রোৎস্কি ও বিলিলোভস্কি উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন দ্রাহোমানোভ, ইভান ফ্রাংকো এবং হ্রীনচেংকো।

ইউক্রানীয় নাট্য সাহিত্যকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন কোৎলিয়ারেভস্কি, শেভচেংকো এবং ওস্ত্রোভস্কি। পরবর্তীকালে স্তারিৎস্কি কয়েকটি মৌলিক নাটক রচনা করেন যথা 'এটা নির্ধারিত ছিল না', 'হিৎ´স যেও না', 'মারুসিয়া বোহুস্লাভকা' প্রভৃতি। মাইকোলা লাইশেংকোর সহযোগিতায় তিনি গোগোলের *Night before Christmas*-এর নাট্যরূপ দান করেন, এবং পরবর্তীকালে 'তারাস বুলবা' অপেরাটিরও। গোগোল ছাড়াও স্তারিৎস্কি কুখারেংকো, নেচুই-লেভিৎস্কি এবং ওরৎসেসকো রচনাবলীরও নাট্যরূপ দান করেন। ক্রোপিভনিৎস্কি, যিনি একজন বিখ্যাত অভিনেতাও ছিলেন, বাস্তবধর্মী নাটক রচনা করে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁর রচিত নাটকসমূহের মধ্যে 'কুলাক বা

মাকড়সা' 'যখন সূর্য উঠবে, শিশির তোমার আঁখি গ্রাস করবে', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের সবচেয়ে শক্তিশালী ইউক্রানীয় নাট্যকার ছিলেন কারপেংকো কারি (১৮৪৫—১৯০৭), সমসাময়িক যুগের সামাজিক শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব যাঁর 'বাত্রাচ্‌কা', 'মার্তিন বোরুলিয়া', 'একলক্ষ', 'প্রভু' প্রভৃতি নাটকে ফুটে উঠেছে। তাঁর বিখ্যাত নাটক *Sava Chaliy* অষ্টাদশ শতকের পোলাণ্ডের সামন্তশক্তির সঙ্গে ইউক্রানীয় জনগণের সংগ্রাম অবলম্বনে রচিত।

পশ্চিম ইউক্রেনের, অর্থাৎ ইউক্রেনের যে অংশ রুশ অধিকার বহির্ভূত ছিল, বুদ্ধিজীবীরা মস্কোপন্থী এবং অষ্ট্রিয়াপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত ছিলেন, প্রথম দলটির মুখপত্র ছিল 'প্রাভদা', 'ৎসোরিয়া', ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় দলটির মুখপত্র ছিল 'স্লোভো', 'রুশকীজিয়ন' প্রভৃতি পত্রিকা। কালক্রমে এখানে এই দুই দলের থেকে বেরিয়ে আসা একটি তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই শক্তি মূলত বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য নির্ভর হয়েছিল। শেভচেংকোর রচনাসমূহ পশ্চিম ইউক্রেনেও বিশেষ আদৃত ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দুই খণ্ডে তাঁর 'কোবৎসার' কাব্যগ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল প্রাগ থেকে, এবং এই সংস্করণে যে সকল কবিতা রুশিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সেগুলিও স্থান পেয়েছিল। রক্ষণশীল এবং পুরাতন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী সমালোচকেরা তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিকোণে শেভচেংকোর অপব্যাখ্যা করারও প্রয়াস পেয়েছিলেন, যদিও এই প্রয়াস বিশেষ ফলবতী হয়নি। পক্ষান্তরে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিশ্বাসী লেখকেরা শেভচেংকোর রচনাসমূহের সুদূরপ্রসারী বৈপ্লবিক তাৎপর্য আবিষ্কার করেন। সর্বপ্রথম এই প্রচেষ্টা করেছিলেন দ্রাহোমানোভ, এবং পরে বিখ্যাত ইউক্রানীয়

সাহিত্য সমালোচক ইভান ফ্রাংকো এবং মিখাইলো পাভলিক। শেভচেংকো এবং ভোভচোকের ভাবধারা সমূহকে পশ্চিম ইউক্রেনে আরও এগিয়ে নিয়ে যান ইউরিফেদকোভিচ।

উনিশ শতকের ইউক্রানীয় সাহিত্যের সর্বশেষ প্রতিভা ছিলেন ইভানফ্রাংকো, যিনি একাধাবে ছিলেন সাহিত্যিক, সমালোচক, পণ্ডিত এবং বৈপ্লবিক ভাবধারায বিশ্বাসী। তিনিই প্রথম সচেতন ইউক্রানীয় লেখক, শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা যাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি যিনি তাঁর 'উধ্ব' এবং নিম্ন' কাব্যগ্রন্থে ভূমিহীন নিরন্ন কৃষক শ্রেণীর পাশাপাশি কলকারখানায কর্মরত শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের কথাও ফুটিয়ে তুলেছেন। বোরিস্লাভ তৈলকেন্দ্রকে অবলম্বন করে তাঁর গল্পগ্রন্থ 'বোরিস্লাভ হাসছে'-এ শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক ভূমিকার উপর তিনি গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'মোজেস'-এ তিনি জনগণের সংগ্রামী চরিত্র অংকন করেছেন। সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার তিনিই ছিলেন প্রথম প্রবক্তা যিনি একটি সচেতন সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, যাঁদের মধ্যে লেসিয়া ইউক্রাইনকা, মিখাইলো কোৎসিউবিনস্কি প্রভৃতি পরবর্তীকালের রুশ-ইউক্রানীয় দিকপাল সাহিত্য রথীরা ছাড়াও পশ্চিম ইউক্রেনের কোভালিভ, কোব্রিনস্কা, ক্রাভচেংকো, বোর্হ্লিয়াক, চাইকোভস্কি, মাকোভি প্রভৃতি ছিলেন। ইউক্রানীয় সাহিত্যে শেভচেংকো যে বৈপ্লবিক আদর্শের সঞ্চার করেছিলেন সে আদর্শকে আরও সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে ইভান ফ্রাংকোর অবদান অতুলনীয়। তাঁর নাটক 'চুরি করা সুখ' একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি যেখানে তিনি পুরাতন মূল্যবোধ সমূহকে বাতিল করে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন। অনুবাদক হিসাবও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

এ ছাড়া ইতিহাস, সাহিত্যতত্ত্ব, লোকচর্যা, অর্থনীতি ও রাজনীতি, নৃতত্ত্ব সকল বিষয়ের উপরই তিনি মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। বিংশ শতকের বহুমুখী ইউক্রানীয় সাহিত্যের তিনি ছিলেন অন্যতম মূল চালিকাশক্তি।

॥ আর্মেনীয় ও জর্জীয় সাহিত্য ॥

আর্মেনীয় প্রজাতন্ত্র, ককেশাস পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত, এবং সেখানকার অধিবাসীদের সংখ্যা আনুমানিক কুড়ি লক্ষ। কিন্তু পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকা আর্মেনীয়দের যোগ করে মোট সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষের কাছাকাছি দাঁড়ায়। জাতি হিসাবে আর্মেনীয়গণ অনেকগুলি জনগোষ্ঠির সংমিশ্রণ, যেগুলির মধ্যে কয়েকটি ওই অঞ্চলে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে বাস করছেন। এই আদি জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এশিয়া, মাইনর, সিরিয়া, ইরাণ প্রভৃতি দেশ থেকে আসা বহু মানুষের মিশ্রণ ঘটেছে এবং সেই হিসাবে আর্মেনীয় সংস্কৃতি একটি মিশ্র সংস্কৃতি। আর্মেনীয় ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয পরিবারের অন্তর্গত, যে পরিবারের অপরাপর সদস্য হচ্ছে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, টিউটন, শ্লাভীয় প্রভৃতি ভাষা। ভারতবর্ষে অষ্ট্রীক, দ্রাবিড় প্রমুখ বিভিন্ন ভাষা পরিবারের লোক বাস করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যেমন ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের একটি ভাষার, অর্থাৎ সংস্কৃতের, প্রভাবই সর্বাধিক হয়েছিল, আর্মেনীয় ভাষার ক্ষেত্রেও সেই রকম ইন্দো-ইউরোপীয় উপাদানটিই প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল।

জর্জীয় প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল আর্মেনিয়া ও আজার-বাইজানের সঙ্গে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ট্রান্সককেশীয় যুক্ত-রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে। জর্জিয়ার স্থানীয় নাম সাক্রাৎবেলো, আর্মেনীয় ভাষায় ব্রাস্তান এবং রুশ ভাষায় গ্রৎসিয়া বা গুর্জী।

জর্জিয়ার পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর, উত্তরে ককেশাস পর্বতমালার একটি অংশ, দক্ষিণপূর্বে আজারবাইজান এবং দক্ষিণে আর্মেনিয়া ও তুরস্কের অংশ অবস্থিত। জর্জীয় ভাষা আর্মেনীয় ভাষারই স্বজাতি, এবং নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহের স্বানীয়, মিংরেলীয়, লাজীয় প্রভৃতি দক্ষিণ ককেশীয় ভাষার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত। জর্জীয় সাহিত্যের সঙ্গে আর্মেনীয় সাহিত্যের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। অনেক জর্জীয় রচনা আর্মেনীয়তে অনূদিত হয়েছে, আবার আর্মেনীয় রচনারও অনুবাদ হয়েছে জর্জীয় ভাষায়। অনেক ক্ষেত্রে কোন্‌টি মূল এবং কোন্‌টি অনুবাদ তা নির্ণয় করা শক্ত। কয়েকটি রচনাকে আবার উভয় সাহিত্যই নিজেদের আদি পর্যায় বলে দাবি করে, এখানে যেমন চর্যাপদগুলির দাবিদার বাংলা এবং হিন্দী সাহিত্য উভয়েই। এই কারণেই আমরা এই দুই সাহিত্যের ইতিহাস একত্রে আলোচনা করছি।

আর্মেনীয় সাহিত্যের বিকাশের কাল হিসাবে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকেই সাধারণত শুরু করা হয়। আর্মেনিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও সিরিয়াক ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ সমূহের প্রাবল্য ঘটে। আনুমানিক ৪১০ খৃষ্টাব্দে সেন্ট মেসরোব আর্মেনীয় বর্ণমালার উদ্ভাবন করেন। তিনি এবং সাহক রাজা ব্রানসাপু-র উৎসাহে গ্রীক এবং সিরিয়াক থেকে অনুবাদের জন্য একটি অনুবাদক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন। এইভাবেই ভবিষ্যৎ আর্মেনীয় সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ক্লাসিকাল আর্মেনিয়ান বলতে যা বোঝায় তা খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা। আধুনিক আর্মেনীয় ভাষা ও তার আঞ্চলিক অভিব্যক্তি সমূহের সৃষ্টি হয়েছে, পৃথিবীর অপরাপর বহু ভাষার মতই, উনিশ শতক থেকে।

অনুরূপ ইতিহাস জর্জীয় ভাষারও। জর্জীয়ভাষা খুবই

পুরাতন, এমনকি পঞ্চম শতকের কোন কোন লেখমালাতেও প্রাচীন জর্জীয় ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে এই পর্যায়ের জর্জীয় ভাষা বর্তমানে প্রায় দুর্বোধ্য। খৃস্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই জর্জিয়ায় খৃষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে যার ফলে লিখিত জর্জীয় সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়। জর্জীয় বর্ণমালার সৃষ্টিকাল পঞ্চম শতক যা গড়ে উঠেছিল খৃষ্টীয় প্রচারকদের চেষ্টায়। জর্জীয় ভাষায় আর্মেনীয় ও গ্রীক থেকে প্রচুর শব্দ গৃহীত হয়েছে। দশম ও একাদশ শতক থেকেই জর্জীয় ভাষার উন্নতির কাল, এবং ওই সময়ের জর্জীয় ভাষাই ক্লাসিকাল জর্জিয়ান নামে পরিচিত। আধুনিক জর্জীয় ভাষার সৃষ্টি হয়েছে বলতে গেলে উনিশ শতক থেকে।

কিন্তু বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এরও পূর্বে একটি প্রাক্-খৃষ্টীয় সাহিত্যের অস্তিত্ব আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া উভয় দেশেই বর্তমান ছিল, যার বিষয়বস্তু ছিল অনুষ্ঠানগীতি, মহাকাব্য, বীরগাথা ও নাটক। কিন্তু এই অ-খৃষ্টীয় তথা প্রাক্-খৃষ্টীয় সাহিত্যের অধিকাংশই খৃষ্টীয় প্রচারক ও পুরোহিতদের অসহিষ্ণুতার জন্য বিলুপ্ত হয়েছে। খোরেনের মোজেস (মোবসেস খোরেনাৎসি) তাঁর সুবিখ্যাত আর্মেনিয়ার ইতিহাস গ্রন্থে এই জাতীয় প্রাক্-খৃষ্টীয় প্রাচীন সঙ্গীত ও কবিতার কিছু কিছু নিদর্শন উপস্থাপিত করেছেন, যেগুলি দেবতা ভহগ্ন ও রাজা আর্তাশেষের উদ্দেশ্যে রচিত। এই প্রাক্-খৃষ্টীয় প্যাগান ঐতিহ্য জর্জিয়াতেও রীতিমত শক্তিশালী ছিল, তবে আর্মেনিয়ায় যেমন প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা তার কিছু-কিছু অংশ সংরক্ষিত করেছিলেন, জর্জিয়ায় তেমনটি ঘটেনি। তবুও জর্জীয় সাহিত্যে প্রাক্-খৃষ্টীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসাবে দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, বিখ্যাত জর্জীয় লোকগাথা এথরিয়ানি-র (*Et'hriani*) কথা বলা চলতে পারে, যা আজও

মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়। লিখিত আকার পেতে দেরি হলেও, পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত যে কাহিনীটি নিঃসন্দেহে প্রাক্-খৃষ্টীয় যুগের। এই কথা তারিয়েল (*Tariel*) কাহিনী চক্রের ক্ষেত্রেও খাটে যা অবলম্বনে পরবর্তীকালে বিখ্যাত কবি সোহ্‌ৎ-হা রুস্ত হাভেলি জর্জিযার জাতীয মহাকাব্য *Vep'khis-Taosani* রচনা করেন।

দেবতা ভহ্‌গ্নের উদ্দেশ্যে রচিত সঙ্গীতগুলি আদি আর্মেনীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। ভহ্‌গ্ন ছিলেন বজ্র-বিদ্যুৎ-অগ্নি-সূর্যের দেবতা, যিনি ইরাণে ভেরেথ্রগ্ন, ভারতে বৃত্রঘ্ন (অর্থাৎ বৃত্রবধকারী ইন্দ্র) এবং ব্যাবিলনে মার্দুক নামে কল্পিত হয়েছিলেন। অপরাপর যে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে প্রাচীন আর্মেনীয সঙ্গীত ও কবিতা রচিত হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন আরমাজ্‌দ (যিনি ইরাণে অহুর মজদা ও ভারতে অসুর-মেধা বা বরুণ), অনহিত (যিনি ইরাণে অনাহিত, ব্যাবিলনে ইস্তার-ইনান্ন-ননাইয়া, কালডিয়ায় নানা, বালুচিস্তানে নানী, নৈনিতালে নৈনি, ভারতীয় কুষাণ বংশীয় রাজগণের মুদ্রায় অঙ্কিত নানা, যাঁর সিংহবাহিনী দেবীরূপ প্রাচীন ক্রীটে ও ফ্রিজিয়ায় পাওয়া গেছে), মিহর (ইরানীয় মিথ্র, ভারতীয মিত্র, অর্থাৎ সূর্যদেব), তিউর (ইরানীয় তিস্ত্রয়), সান্দ্রামেৎ (ইরানীয় স্পেনতা আর্মইতি), আস্তালিক, ইত্যাদি। প্রাক্-খৃষ্টীয় যুগে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মেরও কিছু বিকাশ আর্মেনিয়ায় ঘটেছিল। গিষ্ণ (সম্ভবত কৃষ্ণ) নামক একজন ভারতীয় দেবতার পূজা সেখানে প্রসারলাভ করেছিল। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আর্মেনিয়ায় একটি ভারতীয় কলোনী গড়ে উঠেছিল যেখান থেকে সম্ভবত এই দেবতাটির পূজার ব্যাপ্তি ঘটে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে সেণ্ট গ্রেগোরীর আদেশে এই দেবতার মন্দির ও

বিগ্রহ ধ্বংস করা হয়। পঞ্চম শতকের মধ্যেই খৃষ্টধর্ম আর্মেনিয়ার জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়। উপরি-উক্ত দেবতাদের উদ্দেশ্যে কি ধরণের কবিতা রচনা করা হত তার একটি নিদর্শন খোরেনের মোজেসের রচনা থেকে উদ্ধৃত করছি যা দেবতা ভহগ্নের জন্ম কাহিনী অবলম্বনে রচিত ঃ প্রসব বেদনায় কাতর ছিল আকাশ এবং পৃথিবী, কাতর ছিল বেগুনী রং-এর সমুদ্র ; সেই বেদনা সমুদ্রে জন্ম দিল একটি ছোট নল, যা থেকে বার হল ধেঁায়া, বার হল অগ্নিশিখা ; আর সেই শিখা থেকে ছুটে এল একটি শিশু, যার চুলগুলি আগুনের শিখার মত, আর চোখ দুটি যেন সূর্যের মত।

প্লুটার্ক লিখেছেন যে আর্মেনীয় রাজ সভায় গ্রীক নাটকসমূহ অভিনীত হত, এবং তিনি এই প্রসঙ্গে ইউরিপেডিস রচিত বাক্কেই নাটকের অভিনয়ের কথা বলেছেন। তিনি এও জানিয়েছেন যে সম্রাট দ্বিতীয় আর্তাশেষ (৫৩-৩৪ খৃষ্টপূর্বাব্দ) সুলেখক ছিলেন এবং গ্রীক ভাষায় তিনি ট্রাজেডি ও ইতিহাস রচনা করেছিলেন। আদি আর্মেনীয় নাটকসমূহ ছিল ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত। যারা অভিনয় করত তাদের বলা হত গুসান এবং বর্দজক। রাজা আর্তাশেষকে (আর্তাবাসদেস) কেন্দ্র করে রচিত কাহিনীসমূহ চারণ কবিরা এখানে ওখানে গেয়ে বেড়াতেন, খোরেনের মোজেস এ কথার উল্লেখ করেছেন। আর্মেনিয়ার ইতিহাসে আর্তাশেষ ছিলেন দুজন, একজন খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের, অপরজন প্রথম শতকের। এই দুই রাজার মধ্যে কোন জন যে কাহিনীর নায়ক তা বলা কঠিন। তবে আর্তাশেষ কাহিনীসমূহই আর্মেনিয়ার প্রথম জাতীয় মহাকাব্য। সকল প্রাচীন মহাকাব্যের নায়কের মতই আর্তাশেষ একজন ভাগ্যবিড়ম্বিত মহাবীর, যিনি বহু শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজের হৃত রাজ্য সম্পদ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু

যাঁর ব্যক্তিগত জীবন অবিশ্বস্ত পত্নী সাথেনিকের ক্রিয়াকলাপের ফলে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। আরও একটি প্রাচীন আর্মেনীয় কাহিনী প্রাচীনতর যুগের "মৃত্যু ও পুনরুত্থানের" বিষয়বস্তু অবলম্বনে গড়ে উঠেছিল। রাণী শামিরম সুন্দর আরা-কে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু প্রতিদানে আরার ভালবাসা না পাওয়ার দরুণ তিনি তাঁকে ক্রোধ-বশত হত্যা করান। পরিশেষে তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হন, এবং আরাকে পুনরায় বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই কাহিনীর উপর ব্যাবিলনীয় ইস্তার-তম্মুজ, মিশরীয় আইসিস-ওসিরিস, গ্রীক ও সিরীয় আফ্রোদিতি-আদোনিস প্রভৃতি কাহিনীর প্রভাব বর্তমান।

দ্বিতীয় আরসাক (৩৫০-৩৬৭ খৃষ্টাব্দ) যখন আর্মেনিয়ার রাজা ছিলেন সেই সময় আর্মেনিয়া অধিকারের জন্য রোমক ও সাসানীয় সম্রাটগণের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু আর্মেনীয়গণ বীরত্বের সঙ্গে দু'দিকের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন। আসলে সকল প্রাচীন আর্মেনীয় রচনাই শত্রুর বিরুদ্ধে আর্মেনীয়দের প্রচণ্ড প্রতিরোধের কাহিনী। রাজা আরসাকের কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে আর্মেনিয়ায় জনপ্রিয় ছিল। মূল কাহিনীটি পাওয়া যায় পঞ্চম শতকের বিখ্যাত আর্মেনীয় ঐতিহাসিক ফাউস্টাস বিউজান্দাৎসি-র 'আর্মেনিয়ার ইতিহাস'-এ। সাসানীয় বা পারসিকদের আক্রমণকালে রাজা আরসাক রোমকদের সাহায্য চেয়েও পাননি। তাঁর সেনাপতি ভাসাক মামিকোনিয়ানের উপর নির্ভর করে আরসাক পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বন্দী হন। এই কাহিনীর শাখা কাহিনী অজস্র এবং সব মিলিয়ে তা একটি মহৎ ট্রাজেডির রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফাউস্টাস বিউজান্দাৎসি, যাঁর রচিত ইতিহাসে ওই কাহিনী পাওয়া যায়, আসলে ছিলেন বাইজানসিয়ামের অধিবাসী। তাঁর রচিত 'আর্মেনিয়ার ইতিহাস'-এর আনুমানিক

৩১৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ৩৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলী সম্বলিত অংশটি এখনও পর্যন্ত টিঁকে আছে। পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘাজার ফারবেৎসি ফাউস্টাসের ইতিহাসকে ৪৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। পারসিকদের সঙ্গে আর্মেনীয়দের দীর্ঘকালীন সংগ্রামের বিবরণ তাঁর রচনা ছাড়াও এঘিসে ভার্দাপেত রচিত আর্মেনিয়ার ইতিহাসেও বর্তমান।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতককেই ধ্রুপদী আর্মেনীয় সাহিত্যের সুবর্ণযুগ বলা হয়। এই যুগেই গ্রীক থেকে বহু রচনা আর্মেনীয় ভাষায় অনূদিত হয়। মৌলিক রচনা হিসাবে যে গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলির মধ্যে সর্বাগ্রেই আসে এজনিক কোঘ্‌বাৎসি রচিত "সম্প্রদায় সমূহ খণ্ডন"। যদিও রচনাটির প্রকৃতি ধর্মীয় তা হলেও এতে প্রাচীন ইতিহাস, বীরগাথা প্রভৃতির অভাব নেই। পূর্বকথিত আর্তাশেষ কাহিনীচক্রের অনেকটা অংশই এই গ্রন্থে আছে, বিশেষ করে আর্তাশেষের পুত্র আর্তাবজ্‌দের কাহিনী। আর্মেনীয় লোক কাহিনী অনুযায়ী, যা একাদশ শতকে গিগোর মাজিস্ট্রোস লিপিবদ্ধ করেছিলেন, জনপ্রিয় সম্রাট আর্তাশেষ মারা গেলে শোকগ্রস্ত প্রজারা দলে দলে আত্মহত্যা করতে শুরু করে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে আর্তাশেষের পুত্র আর্তাবিজ্‌দ মৃত পিতার উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি যদি সকলকেই নিয়ে যাবেন তাহলে আমি কাকে নিয়ে রাজত্ব করব? ফলে আর্তাশেষের আত্মা কফিন থেকে পুত্রকে অভিশাপ দেন যে তাঁকে মাসিস পাহাড়ের একটি গুহায় আজীবন বন্দী থাকতে হবে। আর্তাবজ্‌দের জীবনে এই অভিশাপ সত্য হয়েছিল। কোঘবাৎসির রচনায় বলা হয়েছে যে শত্রুহস্তে বিপন্ন আর্মেনিয়াকে রক্ষা করার জন্য আর্তাবজ্‌দ একদিন গুহা থেকে মুক্তি পাবেন।

পঞ্চম শতকের আর্মেনীয় সাহিত্যের আরও একটি উল্লেখযোগ্য

রচনা হচ্ছে সেণ্ট গ্রেগোরির জীবনী। গ্রন্থটির লেখকত্ব আরোপ করা হয়েছে আগাথাদেলোস নামক জনৈক সন্ন্যাসীর উপর। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তিনি ছিলেন সম্রাট তিরিদাতেসের একান্ত সচিব এবং জাতিতে গ্রীক। কিন্তু এখন জানা গেছে যে আগাথাঙ্গে-লোস সেণ্ট গ্রেগোরিরই একটি উপাধি। সে যাই হোক, আলোচ্য গ্রন্থে সেণ্ট গ্রেগোরি কর্তৃক সম্রাট তৃতীয় তিরিদাতেসকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কাহিনী বর্ণিত আছে। ঘটনাটি ঘটেছিল ৩০১ খৃষ্টাব্দে যখন ওই সম্রাটের সঙ্গে বহু আর্মেনীয় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে-ছিলেন। আসলে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ২২৬ থেকে ৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আর্মেনিয়ায় অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী। রচনাটির আদি আর্মেনীয় নাম 'রাজা তেরদাত এবং সাধু গ্রিগোর'। পরবর্তীকালে গ্রীক, জর্জীয় ও আরবীয় ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ হয়।

জর্জীয় সাহিত্যেরও উন্নতির কাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে। ওই সময় আর্মেনীয় থেকে জর্জীয় ভাষায় বাইবেলের কিছু কিছু অংশ অনূদিত হয়েছিল। এ ছাড়া পঞ্চম শতকেই গ্রীক ভাষা থেকে খৃষ্টীয় অনুশাসনাবলী এবং বহু স্তোত্র জর্জীয় ভাষায় অনূদিত হবার প্রমান আছে। অপরাপর ইউরোপীয় দেশের মত জর্জিয়ারও ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের সূত্রপাত সাধুদের জীবনী দিয়েই হয়। এই সব সাধু-জীবনীর মধ্যে ৪৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত সেণ্ট সুসানিকের জীবনীগ্রন্থটি আজও টিঁকে আছে। অপরাপর প্রাচীন রচনার মধ্যে সেণ্ট নিনো কর্তৃক জর্জিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের কাহিনীটির কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা চলতে পারে। এ ছাড়া পঞ্চম শতকের বীর রাজা ভাখতাঙ্গ গোর্গাস্তানি, অর্থাৎ জর্জিয়ার ভাখতাঙ্গকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনীচক্রের কথা এ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। রাজা আর্থার বা কুচুলাইন-সাগার মত এই কাহিনীগুলির চরিত্র আধা

ঐতিহাসিক আধা-পৌরাণিক। এই কাহিনীগুলিই আবার পরবর্তী-কালে রচিত জর্জীয় ক্রনিকল কার্তলিস-ৎসখোভ্রেবা গ্রন্থে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আর্মেনীয় সাহিত্যের তুলনায় জর্জীয় সাহিত্যে ক্রনিকল-ধর্মী রচনার সংখ্যা অনেক কম।

পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে অনেকগুলি গ্রীক রচনা আর্মেনীয় ভাষায় অনূদিত হয় যেগুলির অনুবাদকত্ব জনৈক "অজেয় ডেভিডের' উপর আরোপিত। সিরিয়াক থেকে অনূদিত হয়েছিল নিউ টেস্টামেন্ট, ইউসেবিয়াস রচিত ইতিহাস ও সম্রাট কনস্টান্টাইনের জীবনী, ওরিয়াস ও সামানার আইনসমূহ এবং আফ্রাতেস ও এফ্রেম সাইরাসের রচনাবলী। গ্রীক থেকে অনূদিত হয়েছিল ইউসেবিয়াসের ক্রনিকল এবং জোসেফাসের রচনা সমূহ। সিউনিকের বিশপ পিটার (পেত্রোস) ৫৪৭ থেকে ৫৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যার নাম 'দেবজননীর উদ্দেশ্যে স্তুতি'। সপ্তম শতকে বিশপ সেবেওস রচনা করেছিলেন "হেরাক্লিয়াসের ইতিহাস' যাতে পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর সঙ্গে বাইজানসিয়াম রাজশক্তির সংঘর্ষ ও আরব অধিকারের কাহিনীসমূহ বলা হয়েছে। ওই একই সময়ে আনানিয়া শিরাকাৎসি অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলের উপর কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত ভূগোল বইটি অবশ্য নবম শতকের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক খোরেনের মোজেসের নামে চলে। অষ্টম শতকের আরও উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে ঘেবন্দ ভার্দাপেত রচিত 'খলিফাদের ইতিহাস' এবং ওদসুনের চতুর্থ জন রচিত বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থ। জনের লেখকত্বের কাল ৭১৭ থেকে ৭২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

অষ্টম থেকে দশম শতকের মধ্যে আর্মেনিয়ার জাতীয় মহাকাব্য 'সাসুনের ডেভিড (*Sasuntsi Davith*) রচিত হয় যদিও তা

লিখিত আকারে আমাদের কাছে এসেছে অনেক পরে, উনিশ শতকে। সাস্থনের ডেভিড ছিলেন আর্মেনিয়ার জাতীয় বীর যাঁর কাহিনীগুলি আদিতে রচিত হয়েছিল গাথার আকারে, যেগুলি যুগের পর যুগ ধরে গীত হত লোক মুখে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিশপ গারোকিন সেরবান্দৎসিয়াস্তস সাস্থন জেলা থেকে অনেকগুলি ডেভিড গাথা সংগ্রহ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আকাদেমিসিয়ান মানুক আবেঘিয়ান আরও একদফা ডেভিড-গাথা সংগ্রহ করেন। বিখ্যাত আর্মেনীয় কবি হোভান্নেস থুমানিয়ান (১৮৬৯-১৯২৪) প্রাপ্ত ডেভিড-গাথাগুলিকে একটি কাব্যরূপ দান করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অন্যূন কুড়ি দফা ভিন্নপাঠ সহ ডেভিড-কাহিনী আবিষ্কৃত হয়। এগুলি সংগ্রহ ও জনপ্রিয় যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হোবসেবিয়ান, দতিয়ান, হাইকুনি, খালাতিয়াস্ত, লালায়ান, গানায়ান, চিতৌনি প্রভৃতি। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সমগ্র আর্মেনিয়াতে সাড়ম্বরে ডেভিডের সহস্রবার্ষিকী পালন করা হয় এবং এই উপলক্ষে আবোভ, আবেঘিয়ান, ওহাঞ্জানিয়ান এবং ঘানালিয়ান এই চারজন অধ্যাপকের সম্পাদনায় ডেভিড সংক্রান্ত সমস্ত গাথাগুলিকে একত্র করে প্রকাশ করা হয়। এই গ্রন্থটির রুশ অনুবাদ ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯-এর ডিসেম্বরে আর্মেনিয়ার রাজধানী এরেভান-এ বিখ্যাত ভাস্কর স্থরেন খোচার নির্মিত ডেভিডের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে গ্রিগোর গ্রিগোরিয়ান আধুনিক আর্মেনীয় ভাষায় ডেভিড মহাকাব্যের একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত করেন।

সাস্থনের ডেভিড মহাকাব্যটি চারভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে সানাসার এবং বাঘদাসারের কাহিনী যাঁরা ছিলেন ডেভিডের পিতামহ ও তাঁর ভাই। আর্মেনিয়ার রাজা গাজিকের লুসিক নামে

এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। বাগদাদের আরব খলিফা অস্ত্রের জোরে তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করতে গাজিককে বাধ্য করেছিলেন। খলিফার সঙ্গে বিবাহের পূর্বেই সুসিক অলৌকিক উপায়ে গর্ভবতী হয়েছিল, যার ফলে তার যমজ সন্তান জন্মায়, সানাসার ও বাঘদাসার। নানা ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে দুই ভাই আর্মেনিয়ায় ফিরে আসে প্রভূত শক্তির অধিকারী হয়ে বাগদাদের খলিফাকে নিহত করে।

দ্বিতীয় অংশে আছে সানাসারের পুত্র মেহেরের কাহিনী। সানাসার মারা গেলে মিশরের আরব রাজা মেশরা-মালিক আর্মেনিয়া আক্রমণ করেন, কিন্তু মেহেরেব হাতে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হন। তখন মেশরা-মালিক তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন এবং উভয়ে পরম বন্ধুতে পরিণত হন। স্থির হয় যে তাঁদের মধ্যে যিনি আগে মারা যাবেন, তাঁর স্ত্রীপুত্রকে অন্যজন দেখাশোনা করবেন। মেশরা-মালিক আগে মারা যান, এবং কথা অনুযায়ী মেহের মিশরে গিয়ে মেশরা-মালিকের পত্নী ইসমাইল-খাতুনের দেখাশোনা শুরু করেন। ইসমাইল-খাতুন মেহেরকে সাত বছরের পুরাতন মদ্য পান করিয়ে তাঁর স্মৃতিশক্তি লুপ্ত করে দেয। একদা অন্তঃপুরে আর্মেনিযা আক্রমণের একটি চক্রান্তের কথা শুনে মেহের স্মৃতিশক্তি ফিরে পান এবং আর্মেনিয়ায় ফিবে আসেন। তিনি আর্মেনিয়ায় ফিরে আসার পর তাঁর পত্নী আর্মালান গর্ভবতী হন, এবং যেদিন ডেভিড জন্মগ্রহণ করেন সেই দিনই তাঁর পিতামাতা, মেহের ও আর্মালান মারা যান।

মহাকাব্যের তৃতীয় অংশটি ডেভিডকে কেন্দ্র করে রচিত। মেহেরের মৃত্যুর সুযোগে মিশরীয়রা আর্মেনিয়া অধিকার করে। বালক ডেভিড মেষপালকদের মধ্যে মানুষ হয়। যৌবনে পদার্পণ

করে ডেভিড তার নিজস্ব পরিচয় জানতে পারে এবং নিজের অনুচরদের নিয়ে মিশর আক্রমণ করে। বহু সৈন্যক্ষয়ের পর স্থির হয় যে ডেভিড ও মিশররাজ (এরও নাম মেশরা-মালিক, অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মেশরা-মালিক একটি উপাধি যার অর্থ মিশরের মালিক বা রাজা) পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে, এবং তাঁর উপরেই জয়পরাজয় নির্ধারিত হবে। ডেভিড সহজেই মেশরা মালিককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করে আর্মেনিয়াকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। বিজয়গৌরবে ডেভিড স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে এবং আর্মেনীয়গণ তাকে 'ফর্‌থ হাল্‌তকন সাসুন্তসি দাভিথিন' এই বলে অভিনন্দিত করে। সিংহাসনে আরোহণ করার পর ডেভিড খান্দুত নামে এক রাজকন্যার প্রেমে পড়ে। তাদের যথারীতি বিবাহ ও একটি পুত্রসন্তান জন্মায় যার নাম দেওয়া হয় ফোক্‌র মেহের বা ছোট মেহের। অতঃপর ডেভিড গিউর্জিস্তান বা জর্জিয়ার বিরুদ্ধে সাত বছর ব্যাপী একটি অভিযান চালায। ডেভিডের দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতিতে তার পুত্র মেহের তার অনুসন্ধানে বার হয়। উভযের যখন সাক্ষাৎকার ঘটে তখন কেউই কাউকে চিনতে পারে না। শাহনামায় বর্ণিত রুস্তম-সোহ্‌রাবের মত পিতাপুত্রে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়ে উভয়কে চিনতে পারে। তথাপি ডেভিড ক্রুদ্ধ হয়ে মেহেরকে এই বলে অভিশাপ দেয় যে তার কোনদিন মৃত্যু হবেনা এবং সে চিরকাল নিঃসন্তান থাকবে। বাইজান্টাইনের রাজা চেমেশকিক তার কন্যার সঙ্গে ডেভিডের বিবাহ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার দরুণ সে বিষপ্রয়োগে ডেভিডকে হত্যা করে। ডেভিডের পুত্র মেহের অবশ্য চেমশকিককে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল।

ডেভিড মহাকাব্যের চতুর্থ অংশে আছে ডেভিডের পুত্র মেহেরের

কাহিনী। পিতার মৃত্যুর পর মেহের সারা জগত পরিভ্রমণ করে এবং সর্বত্রই ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তার সময়ে বাগদাদের আরবগণ আর্মেনিয়ার উপর বারবার হামলা করার ফলে মেহের সোজাসুজি বাগদাদ আক্রমণ ও আরবদের পরাস্ত করে। মেহের বিবাহ করেছিল রাজা পাজিকের কন্যা গোহারকে, কিন্তু অল্পদিন পরই তার পত্নী বিয়োগ হয়। মেহের পুনরায় পরিব্রাজকের জীবন গ্রহণ করে। ডেভিড মহাকাব্য ও আর্মেনীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মেহের এখনও ভান হ্রদের তীরে একটি পাহাড়ের গুহায় বন্দী অবস্থায় আছে এবং যেদিন আর্মেনিয়া সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত হবে সেদিন সে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করবে। মেহের-কাহিনীর উপর পূর্বোল্লিখিত আর্তাবজদ-কাহিনীর প্রভাব আছে, যে কাহিনীর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল কোঘবাৎসির রচনায় এবং যা গ্রিগোর মাজিস্ট্রোস কর্তৃক পুনর্লিখিত হয়েছিল।

'সাসুনের ডেভিড' মহাকাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ হচ্ছে এই যে ডেভিড সেই সংগ্রামী জনগণের প্রতীক যাঁরা অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে বীর বিক্রমে বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিরোধ করেছিলেন। মহাকাব্যের সর্বত্রই ডেভিড তাঁর বংশের সকলকে দারিদ্রের বন্ধু হিসাবে এবং বিপর্যয়ের দিনে মুক্তিদাতা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

এবারে জর্জীয় সাহিত্যের প্রসঙ্গে আসা যাক। নবম শতকের জর্জীয় সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হচ্ছে ইওদাসাফ ও বালাহ্‌বারের কাহিনী। মূল কাহিনীটি ভারতীয়, বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে রচিত, কিন্তু কালক্রমে এই কাহিনী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবেশ করে, এবং কাহিনীটিকে খৃষ্টধর্মের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এই কাজটি জর্জীয় ভাষাতেই

সর্বপ্রথম করা হয়। আফগানিস্তান ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে ও মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, এবং এই সকল স্থানে প্রচলিত বুদ্ধ-সংক্রান্ত বহু কাহিনী আরবীয় সাহিত্যে গৃহীত হয়। আলোচ্য কাহিনীটি সর্বপ্রথম আরবীয় গ্রন্থ 'কিতাব বিলাওহার বা যুদাসফ'-এ স্থান পায়। জর্জীয় সংস্করণ রচিত হয় নবম শতকে ওই আরবীয় গ্রন্থ বর্ণিত কাহিনী থেকে। তারপর জর্জীয় ইওদাসাফ ও বালাহ্‌বারের কাহিনীটির গ্রীক রূপান্তর হয় জোসাফৎ ও বারলামের কাহিনীতে। গ্রীক কাহিনীটির লেখক দামাস্কাসের সেণ্ট জন। গ্রীক রচনাটির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন জি. আর. উডওয়ার্ড এবং এইচ ম্যাটিংলি, এবং তা লোয়েব ক্লাসিকাল সিরিজে প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। গ্রীক সংস্করণটির অনুসরণে ল্যাটিনসহ অপরাপর ইউরোপীয় ভাষায় কাহিনীটির রূপান্তর ঘটে। আর্মেনীয় ভাষাতেও কাহিনীটি পাওয়া যায়। অতি সংক্ষেপে কাহিনীটি হচ্ছে এই যে, আবেন্নার নামক একজন ভারতীয় পৌত্তলিক রাজা ছিলেন, যিনি খৃষ্টানদের উপর রীতিমত অত্যাচার করতেন। তাঁর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে যার নাম রাখা হয় জোসাফৎ। জ্যোতিষীরা গণনা করে জানান যে এই পুত্র কালক্রমে সংসারত্যাগী হবে। ফলে রাজা আবেন্নার জোসাফৎকে বালক বয়স থেকেই অত্যন্ত ভোগবিলাসের মধ্যে বাস করতে বাধ্য করেন যাতে তার অন্যদিকে মতিগতি না যায়। কিন্তু দৈবক্রমে একদিন নগর পরিভ্রমণকালে জোসাফৎ একটি জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখেন। দ্বিতীয় দিন তাঁর চোখে পড়ে একটি ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ, তৃতীয় দিনে একটি মৃতদেহ। জোসাফৎ তখন জরা-ব্যাধি-মৃত্যুরূপ দুঃখকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, এবং পার্থিব জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠেন। অতঃপর তিনি একদা গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করেন

একাদশ শতকের শেষের দিকে বৃহত্তর আর্মেনিয়ার পতন হয়। রাজনৈতিক দিক থেকে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতি কিন্তু রুদ্ধ হয়নি। দ্বাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্মেনীয় কবি ছিলেন কাথলিকোস নেরসেস (চতুর্থ) শ্নোইলি। ইনি সাইলেসীয় আর্মেনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। কবিতা ছাড়াও ইনি গদ্য রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গদ্য রচনার নাম 'গ্রীক গীর্জার সঙ্গে সংযুক্তির প্রশ্ন।' তাঁর ভাগ্নে কাথোলিকোস গ্রিগোর (চতুর্থ) পহ্‌লবুনি জেরুসালেম বিজয়ের উপর একটি বিষাদাত্মক গাথা রচনা করেন রচনাকাল ১১৭৩ থেকে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। পূর্বদিকে অ্যানি অঞ্চলের অধিবাসী স্যামুয়েল (১১৩৩-১২১৩) একটি ক্রনিকল রচনা করেন যাতে ১১৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে। ককেশীয় আল-বানিয়া অঞ্চলের অধিবাসী মৃখিথার গোস দ্বাদশ শতকে একটি আইনগ্রন্থ সংকলন করেন যা পরবর্তীকালে আর্মেনীয় আইনের ভিত্তি হয়।

জর্জীয় সাহিত্যে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ কবি হিসাবে দুজনের নাম করা যায়, যাঁরা হচ্ছেন ইওআনে স্হাভতেলি এবং চাখ-রুখাদসে। এঁরা যথাক্রমে রাজা দ্বিতীয় ডেভিড (১০৮৯-১১২৫) এবং রাণী তামারা-র (১১৮৪-১২১৩) উদ্দেশ্যে অনেকগুলি প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করেছিলেন। রাণী তামারা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্ভবত তাঁর আমলে জর্জিয়ার জাতীয় মহাকাব্য *Vep' khis-Taosani* রচিত হয়। এই মহাকাব্যটির রচয়িতা ছিলেন সোহ্‌ৎ-হারুস্ত-হাভেলি যাঁর সম্পর্কে আমরা খুব অল্পই জানি। কেউ কেউ বলেন যে রুস্ত-হাভেলি একটি ছদ্মনাম। সে যাই হোক, দেড় হাজারেরও অধিক স্তবকে রচিত এই মহাকাব্যটি জর্জিয়ার

জাতীয় বিকাশের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে রুস্ত-হাভেলির ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা লেখেন, তাঁরা হচ্ছেন সপ্তদশ শতকের রাজ কবিদ্বয়, প্রথম তিমুরজ (১৫৮৯-১৬৬৩) এবং আর্চিল (১৬৪৭-১৭১৩)। উক্ত মহাকাব্যটির ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন ওয়ার্ডরোপ, যা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল *The Man Panther's Skin* নাম দিয়ে।

ত্রয়োদশ শতকে পূর্ব আর্মেনিয়ায় তিনটি মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়—কিরাকোস গান্ধৎসাকাৎসি রচিত 'সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', ভার্দান ভার্দাপেত রচিত 'সর্বজাগতিক ইতিহাস' ও 'তীরন্দাজদের ইতিহাস'। শেষোক্ত রচনাটি মোঙ্গোলদের ইতিহাস সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য রচনা। সাইলেশীয় আর্মেনিয়ায় ত্রয়োদশ শতকে বহ্‌রম রহ্‌বুনি রুবেনীয় বংশের একটি ক্রনিকল রচনা করেছিলেন যাতে তৃতীয় লিও-র রাজত্বকাল পর্যন্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই ক্রনিকলটি আগাগোড়াই ছন্দে রচিত। কনস্টেবল সাম্বাৎ (১২০৮-১২৭৬) একটি 'ছোট আর্মেনিয়ার' (সাইলেসীয় আর্মেনিয়া) ইতিহাস রচনা করেন। এ ছাড়া তিনি ফরাসী থেকে আন্তিয়োক্কের প্রবন্ধাবলী আর্মেনীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

চতুর্দশ শতকে দেখা যায় যে আর্মেনীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্ব আর্মেনীয়ার লেখকগণ বিশেষ করে যাজক সম্প্রদায় থেকে এসেছেন, যেখানে সাইলেশীয় আর্মেনিয়ার লেখকগণ মূলত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন শ্রেণী থেকে এসেছেন। চতুর্দশ শতকের উল্লেখযোগ্য রচনা সমূহের মধ্যে প্রথমেই আসে আর্কবিশপ স্তেফানোস ওরবেলি-য়ানের এখমিয়াদসিন গীর্জা সংক্রান্ত একটি রচনা। ওরবেলিয়ান মারা যান ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে। এরপর আসে গ্রেগোরি তাথেভাৎসির

কথা যাঁর জীবনকাল ছিল ১৩৪৬ থেকে ১৪১১ পর্যন্ত। ম্যানিকীয় এবং ইসলামধর্মের বিভিন্ন ক্রটির দিক দেখিয়ে তিনি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। চতুর্দশ শতকে ল্যাটিন ভাষা থেকে অসংখ্য গ্রন্থ আর্মেনীয় ভাষায় অনূদিত হয়, যেগুলির মধ্যে বিখ্যাত টমাস অ্যাকুইনাসের রচনাবলীর অনুবাদ। চতুর্দশ শতকে আর্মেনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ফ্রিক।

১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে মামেলুকদের হাতে সাইলেসীয় আর্মেনিয়ার পতন ঘটে। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে হয় তৈমুরের আক্রমণ। এই সকল রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব নিঃসন্দেহে সাহিত্যের উপরেও পড়েছিল। পঞ্চদশ শতকে মেস্তোবের টমাস (১৩৭৯-১৪৪৬) রচনা করেছিলেন 'তৈমুরের ইতিহাস', আমাসিয়ার আমিরদোবলাত (১৪১৫-১৪৯৬), যিনি কনস্টান্টিনোপলে বাস করতেন, কয়েকটি আরবীয় ও গ্রীক রচনার আর্মেনীয়করণ করেছিলেন। পঞ্চদশ শতকে তাথেভের অ্যাবট আরাকুয়েল সিউনেৎসি বিখ্যাত 'আদমের পুস্তক' রচনা করেন। অংশত গদ্যে এবং অংশত কবিতায় লিখিত এই কাব্যটিকে 'প্যারাডাইস লস্টের' সঙ্গে তুলনা করা হয়।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক আর্মেনীয় সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ বলে চিহ্নিত। বিখ্যাত আর্মেনীয় লোককবি নাহাপেত কুচক ষোড়শ শতকের মানুষ ছিলেন। মুখে মুখে প্রেমের কবিতা রচনায় ইনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই জাতীয় কবিদের আর্মেনীয় ভাষায় বলা হয় 'আসুখ', শব্দটি এসেছে আরবীয় 'আশিক' থেকে যার অর্থ প্রেমিক। অবশ্য আর্মেনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ 'আসুখ' ছিলেন আরুথিন সায়াদিয়ান যিনি সায়াৎ নোভা নামেই বিশেষ পরিচিত। ইনি অবশ্য অষ্টাদশ শতকের লোক। এঁর সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে জর্জীয় সাহিত্যের প্রসঙ্গে কিছু বলব, কেননা

ইনি আর্মেনীয়, জর্জীয এবং আজেরি তুর্কী এই তিন ভাষাতেই কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করে বিখ্যাত হযেছিলেন। সপ্তদশ শতকের আরও একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন তাব্রিজেব আরাকুল যাঁব রচিত 'ইতিহাসে' পাবসিকদের সঙ্গে তুর্কীদের যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা আছে। তুবস্কের ইতিহাসের উপব আবও একজন আর্মেনীয লেখক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন, যাঁব নাম চেলাবি কোমুবজিযান। কবি হিসাবেও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বচিত ইস্তাম্বুলের বর্ণনা একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এরেভানেব ওসকান (১৬১৪-১৬৭৫) প্রথম আর্মেনীয বাইবেল ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে আমস্টার্ডাম থেকে মুদ্রিত করেন। অবশ্য এটাই প্রথম আর্মেনীয মুদ্রিত গ্রন্থ নয। আর্মেনীয ভাষায প্রথম যে পুস্তকটি মুদ্রিত হয তা হচ্ছে ধর্মীয অনুষ্ঠান সংক্রান্ত একটি পঞ্জিকা যা ছাপা হযেছিল ১৫১২ খৃষ্টাব্দে।

মঙ্গোল আক্রমণে জর্জিযাব রাজনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হযে যাবাব ফলে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত জর্জীয সাহিত্যেব উন্নতি বীতিমত ব্যাহত হযেছিল, কিন্তু তাব গতি রুদ্ধ হযনি। রাজা ষষ্ঠ ভাখতাঙ্গ (১৬৭৫-১৭৩৭) টিফলিস নগবে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, এবং জর্জিযার পূর্বতন সাহিত্য সম্পদ সমূহ সংগ্রহ ও সম্পাদনা করবাব দাযিত্ব নেন। তাঁর পুত্র ভাখুসতি (১৬৯৫-১৭৭২) স্বয় একজন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ ছিলেন। অষ্টাদশ শতকে জর্জীয সাহিত্য নূতন করে প্রাণ পেয়েছিল আভিধানিক সুলখান-সাবা-ওববেলি-যানির (১৬৫৮-১৭২৫) প্রচেষ্টায়। ওরবেলিযানি বচিত গল্প সংগ্রহ *Dsigni Sibrdzne-Sitsrusia* ইংরাজীতে অনূদিত হযেছিল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ডরোপের প্রচেষ্টায় *The Book of Wisdom and Lies* নামে। অষ্টাদশ শতকের দুজন প্রসিদ্ধ জর্জীয় কবিব

নাম যথাক্রমে ডেভিড গুরামিসভিলি (১৭০৫-৯২) এবং বেসারিয়ন গাবসভিলি (১৭৫০-৯১)। শেষোক্তজন বেসিকি নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। উভয়ের রচনারই উপজীব্য ছিল দেশাত্মমূলক কবিতা। বিখ্যাত সায়াৎ নোভার কথা আমরা আর্মেনীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। তিনি তিনটি ভাষার লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপর জর্জিয়ার দাবিই সমধিক। সায়াৎ নোভার জন্ম টিফলিসে, প্রথম জীবনে তিনি তাঁতির কাজ করতেন, পরে তিনি জর্জিয়ার রাজা দ্বিতীয় ইরাকলির সভাকবি হন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি হাযবাতের মঠে যোগদান করেন, এবং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জর্জিয়ায় পারসিক আক্রমণের ফলে নিহত হন। জর্জীয় ছাড়া আর্মেনীয় ও আজেরি তুর্কী ভাষাতেও তিনি কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে জর্জিয়া রুশ অধিকারে আসে এবং রুশ সাহিত্য ও সেই সঙ্গে বৃহত্তর ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবও জর্জীয় সাহিত্যের উপর পড়ে। রোমান্টিক কবি হিসাবে জর্জিয়ায় উনিশ শতকের শুরুতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন আলেকজান্দার চাভৎচাভাদসে (১৭৮৬-১৮৪৬)। এ ছাড়া প্রেরণা সৃষ্টিকারী কবি হিসাবে নিকোলাস বারাৎ-আশভিলি (১৮১৭-৪৫) যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ব্যঙ্গমূলক কমেডির লেখক হিসাবে গ্রিগোরি এরিস্তাভি (১৮১১-৬৪) যাঁকে আধুনিক জর্জীয় থিয়েটারের প্রবর্তক বলা হয়। শেক্সপীয়ারের নাটকসমূহের জর্জীয় অনুবাদ করেন ইভানে মাচাবেলি (১৮৫৪-৯৮)। বাস্তবতাধর্মী ঔপন্যাসিক হিসাবে লাভেরেন্তি আর্দাজিয়ানি (১৮১৫-৭০) এবং ইলিয় চাভৎচাভাদসে (১৮৩৭-১৯০৭) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জর্জিয়ার পর্বতবাসীদের চিত্র আলেকজান্দার কোয়াৎসবেগি-র (১৮৪৮-৯৩) গল্পসমূহে সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ভাৎস্হা প্‌সাভেলার (১৮৬১-১৯১৫) ব্যালাড সমূহের কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের জর্জীয় সাহিত্যের বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বিখ্যাত কবি আকাকি দ্‌শেরে-তেলি (১৮৪০-১৯১৫) যিনি শুধুমাত্র তাঁর যুগের সাহিত্য সাধনারই প্রতিনিধি ছিলেন না, বিশ শতকের আধুনিক জর্জীয় সাহিত্যেরও যিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

আধুনিক আর্মেনীয় সাহিত্যের প্রকৃত সূত্রপাত অষ্টাদশ শতক থেকে। অষ্টাদশ শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে কাথো-লিকাস আব্রাহাম লিখিত তাঁর নিজ যুগের ইতিহাস যাতে তিনি পারস্যের নাদির শাহের সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পর্কের কথাও বিশেষ-ভাবে লিখেছেন। আর্মেনীয় সাহিত্যের যে বিশেষত্বটি সকলের চোখে পড়ে তা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ধরণের জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনারই প্রাধান্য এখানে। ইতিহাস ছাড়াও ভূগোল, ভূতত্ত্ব, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর অজস্র রচনা অষ্টাদশ শতকের আর্মেনীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে আর্মেনীয়দের মেখিথারিস্ট সম্প্রদায় ভিনিসে এবং পরে ভিয়েনায় তাঁদের সংস্কৃতি কেন্দ্র খোলেন। এখান থেকে তাঁরা পুরাতন ক্লাসিক গ্রন্থগুলি প্রকাশ করা শুরু করেন। এই সব ক্রিয়াকলাপের ফলে প্রাচীন আর্মেনীয় ভাষার সংস্কারেরও প্রয়োজন অনুভূত হয়, এবং আর্মেনীয় বাক্‌ধারা আঞ্চ-লিক আনুগত্যের ভিত্তিতে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, পশ্চিমা ও পূর্বী। পশ্চিমা আর্মেনীয় কবিদের মধ্যে উনিশ শতকের শেষার্ধে যাঁরা বিখ্যাত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মার্কটিচ পেশিক-থাসলিয়ান (১৮২৮-১৮৬৮), তোভমা তেরৎসিয়ান (১৮৪০-১৯০৯) ও পেট্রোস দুরিয়ান (১৮৫১-১৮৭২) এবং বিশ শতকের দানিয়েল

ইয়ারুৎসান (১৮৮৪-১৯১৫)। উপন্যাসের ক্ষেত্রে হাকোব পারোনিয়ান (১৮৪২-১৮৯১) এবং এরুমাণ্ড ওলিয়ান (১৮৬৯-১৯২৬) সামাজিক সমস্যাসমূহকে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু করেছিলেন। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলেন গ্রিগোর ৎসোরাব (১৮৬১-১৯১৫)। পূর্ব আর্মেনীয় সাহিত্যের সবচেয়ে প্রতিভাবান লেখক ছিলেন খাচাতুর আবোভিয়ান (১৮০৫-৪৮) যাঁকে আধুনিক আর্মেনীয় সাহিত্যের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত 'আর্মেনিয়ার ক্ষতসমূহ' (রচনাকাল ১৮৪০) তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ব আর্মেনীয় কবিদের মধ্যে হোভান্নেস থুমানিয়ান (১৮৬৯-১৯২৩) মূলত গীতিকবি ছিলেন। তবে বর্ণনামূলক কাব্যও তিনি লিখেছেন এবং এছাড়া *Anush* নামক একটি জনপ্রিয় মহাকাব্যেরও তিনি লেখক। হাকোব মেলিক হাকোবিয়ান (১৮৩৫-১৮৮৮) আর্মেনীয় সাহিত্যের আরও একজন শক্তিমান লেখক। আজারবাইজানে জাত এই লেখকের ছদ্মনাম ছিল রফি। ইনি ১৮৭২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত বিখ্যাত রুশ আর্মেনীয় পত্রিকা *Mshak* এর নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাসসমূহের মধ্যে 'জালালুদ্দীন' 'নির্বোধ' (১৮৮০, ইংরাজী অনুবাদ ১৯৫০), 'ডেভিড বেক' (১৮৮০), 'মুরগীর বাচ্চা' (১৮৮২), স্ফুলিঙ্গ' (১৮৮৩-৯০) ও 'স্যামুয়েল' (১৮৮৫) বিখ্যাত। ছোটগল্প ও ঐতিহাসিক নিবন্ধ রচনাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আর্মেনীয় জাতীয়তাবাদের তিনি ছিলেন অন্যতম মুখ্য প্রবক্তা।

॥ লিথুয়ানীয় ও ল্যাটভীয় সাহিত্য ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে পাঁচটি প্রজাতন্ত্র সোভিয়েট ইউনিয়নে যুক্ত হয় সেগুলির নাম যথাক্রমে লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, মোলডাভিয়া কারেলিয়া ও এস্তোনিয়া। লিথুয়ানীয় ভাষায় ওই প্রজাতন্ত্রের তিরিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ কথাবার্তা বলেন এবং বাইরেও লিথুয়ানিয়ার অধিবাসীরা যেখানে যেখানে বসতি স্থাপন করেছেন সে সকল স্থানেও নিজেদের ভাষার চর্চা বজায় রেখেছেন। লিথুয়ানীয় ভাষা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—নিম্ন ও উচ্চ, দ্বিতীয়টি অধিকতর প্রাচীন। লিথুয়ানীয় ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় বাল্‌টিক পরিবারে অন্তর্গত। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় বাচন ভঙ্গীর কিছুটা অংশ এখন পর্যন্ত লিথুয়ানীয় ভাষায় বর্তমান। অনেক লিথুয়ানীয় শব্দ পরবর্তীকালে ফিনীয়-মোর্দভিনীয়-চেরেমিশীয় ভাষাভাষী মানুষেরা গ্রহণ করেছেন। লিথুয়ানীয় ভাষা ল্যাটিন বর্ণমালায় লিখিত হয়।

ল্যাটভীয় বা লেটীয় ভাষা বর্তমান ল্যাটভিয়ার কুড়ি লক্ষেরও বেশি মানুষের ভাষা। লিথুয়ানীয় ভাষার মতই ল্যাটভীয় ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর বাল্‌টিক পরিবারের সদস্য, এবং উভয় ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা এত বেশি ঘনিষ্ঠ যে আদিপর্যায়ে উভয় ভাষার পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বতন্ত্রভাবে ল্যাটভীয় ভাষার বিকাশের কারণ বাইরের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার যোগাযোগ। দ্বাদশ শতক থেকেই ল্যাটভীয় ভাষার উপর জার্মান প্রভাব

পড়তে শুরু করেছিল, এবং বহু জার্মান শব্দ এই ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। এই পদ্ধতি চলেছিল উনিশ শতক পর্যন্ত। ল্যাটভীয় ভাষা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য। মধ্য ল্যাটভীয়ই সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রামাণ্য। এই ভাষার কোন নিজস্ব লিপি নেই, ল্যাটিন লিপিতেই দীর্ঘকাল ধরে লিখিত হয়ে এসেছে। বানান ও শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে দু'রকম পদ্ধতি অনুসৃত হয়, একটি জার্মান অপরটি লিথুয়ানীয়। এস্তোনিয়া ল্যাটভিয়ার প্রতিবেশী হবার জন্য ফিনো-উগরীয় ভাষাসমূহের প্রভাব ল্যাটভীয় ভাষার উপর বর্তমান।

লিথুয়ানীয় ও ল্যাটভীয় সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে অন্যান্য অনেক সাহিত্যের মতই মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হবার ফলে, এবং সেটা ষোড়শ শতকের পূর্বে নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে লিখিত ভিন্ন অন্য কোন আকারে এই দুই স্থানে কোন রকম সাহিত্য কর্ম ছিল না। এই দুটি অঞ্চলের, বিশেষ করে ল্যাটভিয়ার, লোক-সাহিত্যের ও লোক সঙ্গীতের ঐতিহ্য বিস্ময়কর। এগুলিকে বলা হয় দিয়ানা (*Diana*)। ১৯০০ থেকে ১৯১৫-র মধ্যে কে. ব্যারনস ৩৫,৭৮৯টি (ভিন্নপাঠ সহ ১৮২,০০০টি) দিয়ানা প্রকাশ করেন। পি. শ্মিটস এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৬০,০০০-এ (ভিন্নপাঠ ব্যতীত) দাঁড় করান। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি ল্যাটভিয়ার রাজধানী রিগায় অবস্থিত ইনস্টিটিউট অফ ল্যাটভিয়ান ফোকলোর মূল ও পাঠান্তর সহ নয় লক্ষের কাছাকাছি দিয়ানা সংগ্রহ করেছেন। এই দিয়ানা-গুলি উক্ত অঞ্চল সমূহের চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি, যেগুলি বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের দিক থেকে বহুমুখী। প্রাচীন দিয়ানাগুলির বিষয়বস্তু ছিল বাল্টিক ভাষাভাষী অঞ্চলের খৃষ্টপূর্ব যুগের দেব দেবীদের নিয়ে রচিত উপাখ্যান সমূহ। এগুলির মধ্যে বেশ

কয়েকটিতে ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের দেবগণের ঐতিহ্য বর্তমান। গ্রীক জিউসের অনুরূপ আকাশের প্রতীক এক দেবতা ওই সকল কাহিনীর নায়ক, আর তাঁকে ঘিরে যে দেবমণ্ডলী তাঁদেরও ক্রিয়াকলাপ নিয়ে অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে। এই সকল কাহিনীর সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত বহু কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। এর কারণ ভাষাগত দিক থেকে লিথুয়ানীয় ও ল্যাটভীয় ভাষা এবং বৈদিক ভাষা একই ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের অন্তর্গত। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত *Balts and Aryans* গ্রন্থে এই সাদৃশ্যের উপর বিশদ আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালের দিয়ানাগুলিতে আরও অনেক নতুন ধরণের দেবদেবীর আবির্ভাব হয়েছে। আরও পরবর্তীকালে খৃষ্টধর্মের প্রভাবও দিয়ানাগুলির উপর লক্ষ্য করা যায়। পুরাতন সাম্যাশ্রয়ী যৌথ সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে যাবার বেদনা এগুলির ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, জমিদারদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের কাহিনীসমূহ দিয়ানাগুলিতে স্থান পেয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সুর এগুলিতে ধ্বনিতে হয়েছে। দিয়ানা আজও নানাভাবে রচিত হয়। আধুনিক দিয়ানাসমূহের বিষয়বস্তু শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ। খণ্ড কবিতা হিসাবে অধিকাংশ দিয়ানাই রীতিমত সাহিত্যগুণ সম্পন্ন।

লিথুয়ানীয় ভাষা অনেক প্রাচীন, কিন্তু সেই অনুপাতে প্রাচীন লিথুয়ানীয় সাহিত্যের অগ্রগতি খুব সন্তোষজনক নয়। এই কথা ল্যাটভীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। লিখিত আকারে ষোড়শ শতকের পূর্বে রচিত লিথুয়ানীয় সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। লিথুয়ানীয় ভাষার আদি গ্রন্থ হচ্ছে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মসম্বন্ধে একটি প্রশ্নোত্তরমালা। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত এই পুস্তিকাটির লেখকের নাম মসভাইডাস, যিনি মারা গিয়েছিলেন

১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এইটিই লিথুয়ানীয় ভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। ষোড়শ শতকে আরও অল্প কয়েকটি গ্রন্থ লিথুয়ানীয় ভাষায় রচিত হয়েছিল, সব কয়টিই ধর্মীয় চরিত্রের। মসভাইডাস ছাড়া ধর্মীয় রচনার লেখক হিসাবে যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন ব্রেটকুনাস বা ব্রেটকে (১৫৩৫-১৬০২)। ল্যাটভীয় সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থটির ল্যাটিন নাম কাটেকিজমাস কাথোলিকোরাম, রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত সংক্রান্ত যে পুস্তিকাটির রচনাকাল ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ। তার পরের বছরেই রচিত হয় প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরমালা।

লিথুয়ানীয় ভাষা অনেকগুলি বাক্‌ধারা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে, এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাক্‌ধারা প্রাধান্য পেয়েছে। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে রচিত *Postile* নামক গ্রন্থে এই বাক্‌ধারার বিভিন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটির লেখকের নাম মিকালোজাস দাউকসা (১৫২৭-১৬১৩)। লিথুয়ানীয় ভাষার প্রথম অভিধান রচনা করেন সিরভাইডাস (১৫৭৯-১৬৩১)। ল্যাটিন-জার্মান-লিথুয়ানীয় এই অভিধানটির নাম 'তিন ভাষার অভিধান' (*Dictionarium Trium Linguarum*), রচনাকাল ১৬২৯। ১৬০০ থেকে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৮১ জন লেখক ও ৭০টি রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু এই রচনাগুলির সাহিত্যমূল্য যৎসামান্য। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট অংশের প্রথম লিথুয়ানীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়, এবং ১৭২৭ এর মধ্যে প্রধান খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থগুলির অনুবাদ হয়।

সপ্তদশ শতকের ল্যাটভীয় সাহিত্যও মূলত ধর্মপ্রধান ছিল। তবে ওই যুগে ল্যাটভিয়ায় কয়েকজন শক্তিমান লেখকের উদ্ভব হয়েছিল যাঁদের রচনার বিষয়বস্তু ধর্ম হলেও সেগুলি সাহিত্যিক

চরিত্র পেতে সমর্থ হয়েছিল। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য কবি ফুয়েরেক্কেরাস। তাঁর রচনার প্রকৃতি ধর্মীয় হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন ল্যাটভীয় কবিদের মধ্যে তিনি সর্বাগ্রগণ্য, এবং ল্যাটভীয় কবিতায় অনেকগুলি নুতন ধরণের ছন্দ প্রবর্তম করাণ কৃতিত্ব তাঁর। অনুরূপভাবে ল্যাটভীয় গদ্য সাহিত্যের জনক হিসাবে যিনি স্বীকৃত তাঁর নাম মানকেলিয়াস। সপ্তদশ শতকের আরও একজন প্রতিভাশালী লেখকের নাম রেইটার্স যিনি বহু ধর্মগ্রন্থ ল্যাটভীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। বাইবেলের ল্যাটভীয় অনুবাদকেব নাম গ্লাক বা গুলিক, এবং অনুবাদকাল ১৬৮৫ থেকে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ। ল্যাটভীয় সাহিত্যের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের বিকাশ হয অষ্টাদশ শতকে জি. এফ. স্টেণ্ডের (১৭১৪-১৭৯৬) বিরচিত ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশিত হবার পর থেকে।

লিথুয়ানীয় সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষ রচনার সংখ্যা অষ্টাদশ শতক থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই শতকে ৬১ জন লেখকের ১৯৮টি মুদ্রিত রচনার পরিচয় পাওয়া গেছে। অষ্টাদশ শতকের লিথুয়ানীয় সাহিত্য জগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন ক্রিস্টিজোনাস ডোনেলাইটেস। ইনিই প্রথম লিথুয়ানীয় কবি যাঁর খ্যাতি লিথুয়ানিয়ার বাইরেও বিস্তারলাভ করেছিল। ডোনেলাইটেস জন্মগ্রহণ করেছিলেন তদানীন্তন পূর্ব প্রুশিয়ার অন্তর্গত লাসডিনলেন নামক গ্রামে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে। তিনি কোনিগ্‌সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে লুথারীয় ধর্মতত্ত্ব এবং প্রাচীন কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করেন (১৭৩৬-৪০)। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত টোলমিঙ্গখেসন নামক একটি গ্রামে সারা জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি জার্মান এবং লিথুয়ানীয় উভয় ভাষাতেই রচনাকার্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর প্রধান

কাব্যগ্রন্থের নাম *Metai* অর্থাৎ ঋতুসমূহ। কাব্যগ্রন্থটি আগাগোড়া ছয়মাত্রিক ছন্দে রচিত। পূর্বে এই ছন্দ কোন লিথুয়ানীয় কবিতায় ব্যবহৃত হয়নি। অষ্টাদশ শতকের লিথুয়ানিয়ার কৃষিজীবন, বিশেষ করে ভূমিদাসদের কথা, এই রচনায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, যদিও বাহ্যত কাব্যগ্রন্থটি চারটি ঋতুর বর্ণনা। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এল. এইচ. রেহ্সা সর্বপ্রথম *Metai* কাব্যটিকে ডাস ইয়ার ইন ফিয়ের গেজাঙ্গেন (*'Das Jahr in Vier Gesangen*) এই শিরোনামায় জার্মান অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নেসসেলমান সম্পাদিত ডোনেলাইটেসের রচনা সংকলনেও উক্ত কাব্যের জার্মান অনুবাদ আছে। আরও একটি জার্মান তর্জমা করেছিলেন পাসার্গে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। ডোনেলাইটেসের অপর একটি রচনার নাম *Aisopas Arba Pasakas.* এটি একটি গল্পসংকলন, গল্পগুলি গ্রীক ও রোমক সাহিত্য এবং লিথুয়ানীয় লোকসাহিত্য থেকে গৃহীত। ডোনেলাইটেসের রচনাবলীর রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হযেছে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে।

উনিশ শতক থেকে লিথুয়ানীয় সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। লিথুয়ানিয়ার জাতীয় জাগরণেরও শুরু ওই সময় থেকে, এবং এই জাগরণের মূলে ভিলিনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের যথেষ্ট অবদান ছিল। জাতীয় জাগরণের সুর উনিশ শতকের গোড়ার দিকে দুজন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, একজনের নাম সিমানাস স্তানোভিসিয়া (১৭৯৯-১৮৪৮) এবং অপরজনের নাম ডায়োনিৎসাস পোস্কা (১৭৫৭-১৮৩০)। লিথুয়ানিয়ার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সর্বপ্রথম রচনা করেন সিমানাস দাউকান্তাস (১৭৯৩-১৮৬৪)। গীর্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন লেখকও উনিশ শতকের লিথুয়ানীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে ভ্রেভারেঙ

স্ত্রাৎসদাস স্ত্রাৎসদেলিস (১৭৬৩-১৮৩৩) ধর্মাশ্রয়ী ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় শ্রেণীর কবিতা রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে বিশপ ভালানসিয়াস (১৮০১-৭৫) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। বিশপ বারানাউস্‌কাস (১৮৩৫-১৯০২) তাঁর *Anyksciu Silelis* নামক কাব্যগ্রন্থের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত (রচনাকাল ১৮৫৮--৫৯) যা ইংরাজীতে *The Forest of Anyksciai* নামে অনূদিত হয়েছে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকেই লিথুয়ানিয়ার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে মেঘ জমতে শুরু করে, প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাতও ধীরে ধীরে ঘটে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন জোনাস বাসানাভিসিয়াস যিনি লিথুয়ানিয়ার প্রথম পত্রিকা *Asura* (প্রভাত) প্রকাশিত করতে শুরু করেন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ থেকে। তিনি একজন বিখ্যাত সংগ্রাহকও ছিলেন এবং লিথুয়ানীয় লোকসাহিত্যের পুনরুদ্ধার করেছিলেন অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে। বাসানাভিসিয়াসকে লিথুয়ানীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলা হয়। তিনি মস্কোয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং চিকিৎসাবিদ্যা গ্রহণ করেছিলেন ওয়ারশ থেকে। লিথুয়ানিয়ায় তাঁর প্রকাশিত পত্রিকাটিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়, এবং তিনি তা গোপনে প্রকাশ করে চলেন পূর্ব-জার্মানীর অন্তর্গত টিলজিট থেকে। ১৯০৫ সালে তিনি লিথুয়ানিয়ার স্বায়ত্ত-শাসন দাবি করেন। ১৯০৭ সালে তিনি লিথুয়ানিয়ার বিজ্ঞান সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, যার তিনি সভাপতি ছিলেন একাদিক্রমে বিশ বছর। ১৯১৮র ফেব্রুয়ারীতে তাঁর নেতৃত্বে একটি সভা লিথুয়ানিয়ার স্বাধীনতা দাবি করে। তিনি দুই খণ্ডে লিথুয়ানীয় লোকসঙ্গীতের সংকলন প্রকাশ করেন, চার খণ্ডে প্রচলিত কথা ও

কাহিনীসমূহের সংকলন, এবং এক খণ্ডে প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও বিশ্বাসের সংকলন প্রকাশ করেন, যেগুলির নৃতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম। এই গুলির প্রকাশকাল ১৯০২ থেকে ১৯০৫ এর মধ্যে। জাতিসমূহের স্থানান্তর গমনের উপর তাঁর গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে।

ভিনকুস কুদিরকা (১৮৫৮-৯৯) লিথুয়ানীয় ছোটগল্প সাহিত্যকে প্রভূত উন্নত করেন। কবি ও গীতিকার হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত একটি সঙ্গীত লিথুয়ানিয়ার জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল। . লিথুয়ানিয়ার নবজাগৃতি আন্দোলনের পুরোভাগে আরও যাঁরা এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জে. মাকিউলিস (ছদ্মনাম মাইরোনিস) যিনি শুধু কবিই ছিলেন না, পরবর্তী লিথুয়ানীয় সাহিত্যের বহু-মুখী বিকাশের যিনি ছিলেন অন্যতম প্রেরণাদাতা, যাঁকে বলা হত লিথুয়ানীয় রেনেসাঁসের কবি ও প্রেরিত পুরুষ। মাকিউলিস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬২র ২রা নভেম্বর তারিখে সিলুভা প্রদেশে। কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি অতঃপর সেণ্ট পিটার্সবার্গের ক্যাথলিক অ্যাকাডেমিতে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন এবং অতঃপর অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করেন। *Puvasario Balsai*-এ প্রকাশিত তাঁর গীতি কবিতা সমূহে (১৮৯৫), *Raseiniu Magde* (১৯০৯) এবং *Musu Vargai* (১৯২০)-এ প্রকাশিত ব্যঙ্গমূলক কবিতাসমূহে এবং *Terp Skausmu i Garbe* সংকলনের কবিতা-গুলিতে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি লিথুয়ানিয়ার জাতীয় আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন। এই একই আদর্শ তাঁর ত্রয়ী নাটক *Kestucio Mirtis, Vytautas pas Kryziuocius* এবং *Vytautas Karalius*-এ প্রতিফলিত হয়েছে। আরও যে

কজন শক্তিমান লেখক যাঁরা উনিশ ও বিশ শতকের সেতুবন্ধরূপে কাজ করেছেন, বিশ শতকের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার ক্রেভে মিকাই ভিকিয়াস ও অপরাপর লেখকদের যাঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষ পূর্বসূরী, তাঁদের মধ্যে দার্শনিক কবি ও নাট্যকার স্টোরাস্টা ভ্যাড়ুনাস, ছোটগল্প লেখক বিলিউনাস, সমালোচক টুমাস ভাইজ্‌গানটেস প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না, যেমন ৎসাইমানটিনে সেমাইটে (১৮৪৫-১৯২১) ছিলেন ছোট গল্পের একজন বিশিষ্ট লেখিকা। তিনি সাহিত্য ছাড়াও নারীমুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

এবারে ল্যাটভীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করা যাক। প্রকৃত অর্থে ল্যাটভিয়ার জাতীয় সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে উনিশ শতক থেকে। জে আলুনান রচিত *Dziesminas* (১৮৫৬) ল্যাটভীয় গীতিকবিতার প্রথম সার্থক সংকলন। উনিশ শতকের ল্যাটভিয়ার কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আউসেক্লিস-এর (অপর নাম এম. ক্রোগৎসেমস) গীতিকবিতাসমূহ এবং পুমপুর রচিত মহাকাব্য *Lacplesis* (ইংরাজী অনুবাদ *Bearslayer,* ১৮৮৮) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। জনপ্রিয় এই মহাকাব্যটির নায়ক ল্যাটভিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধার প্রতীক। ল্যাটভীয় সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস *Mernicku Laiki* ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল, লেখকরা ছিলেন দুই ভাই, আর. এবং এম. কান্দৎসিতেস। এই উপন্যাসটিতে ল্যাটভিয়ার তদানীন্তন গ্রামজীবন অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। ল্যাটভিয়ার জাতীয় জাগরণের অন্যতম হোতা ছিলেন জে. রাইনিস (অপর নাম জে. প্লাইকসান্‌স, ১৮৬৫-১৯২৯)। রিগা জিমনাসিয়ামে সাধারণ শিক্ষার পর তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গে আইন পড়েন এবং তারপর রাজনীতিতে লিপ্ত হন।

শাসকবর্গ তাঁর কার্যকলাপে ভীত হয়ে তাঁকে নির্বাসিত করে, এবং তিনি দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় থাকেন। কবি ও নাট্যকার হিসাবে তিনি ল্যাটভীয় সাহিত্যে রীতিমত গৌরবময় স্থানে অধিষ্ঠিত। শেক্সপীয়াব, গেটে ও শিলারের রচনাবলী তিনি ল্যাটভীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকসমূহের মধ্যে *Uguns un Nakts* (*Fire and Night*) *Put Vejini* (*Blow Breeze*), *Daugava* (*The Divina*) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট নাটক *Jazeps un Vina Brali* তাঁর জীবদ্দশাতেই ইংরাজীতে অনুদিত হয়েছিল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে *Sons of Jacob* নামে। ইংরাজী অনুবাদটি সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে অভিনীত হয় ১৯২৫ এর ২২শে মে তারিখে। রাইনিস ল্যাটভিয়ার ন্যাশানাল থিয়েটার সোসাইটির পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি ল্যাটভীয পার্লামেণ্টের সদস্য হন। তাঁর স্ত্রী আসপাৎসিজা (এলৎসা রোৎসেনবের্গা) কবি ও নাট্যকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

১৮৯০ থেকে ল্যাটভীয় সাহিত্যে দুটি পরস্পর বিবোধী ধারার বিকাশ ঘটেছিল। প্রথমটি ছিল নব রোমান্টিকতাবাদী ধারা যার উদ্‌গাতা ছিলেন জে. পোরুক্‌স (১৮৭১-১৯১১) এবং দ্বিতীয়টি ছিল বাস্তববাদী ধারা যার মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন নাট্যকার ও ছোটগল্প লেখক আর ব্লাউমানিস (১৮৬৩-১৯০৮)। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ল্যাটভীয় সাহিত্যে একদল প্রতীকীবাদী কবির আবির্ভাব হয়েছিল। প্রাচীন যুগের বীরগাথাসমূহ অবলম্বনে নূতন ভঙ্গীতে কাহিনী লিখেছিলেন জে. আকুরাতের্স (১৮৭৬-১৯৩৭)। ইনি গদ্য ও কবিতা উভয় ধরণের রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অপর একজন লেখক উপিতিস, যাঁর জন্ম সাল ১৮৭৭, ফরাসী ও রুশ প্রকৃতিবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রা তাঁর রচনায়

বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল। ফরাসী সাহিত্যের দ্বারা আরও একজন ল্যাটভীয় কবি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যাঁর নাম ই. ভিরৎসা (১৮৮৩-১৯৪০)। তাঁর গদ্যকাব্য *Straumeni* বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক জে. জাউনসুদ্রাবিনস তাঁর *Aija. Atbalss* এবং *Ziema* নামক তিনটি উপন্যাস মারফৎ ল্যাটভীয় জীবনধারার উপর একটি সার্থক ট্রিলজি রচনা করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধকালীন ল্যাটভীয় লেখকদের মধ্যে ঔপন্যাসিক স্ট্রালাস, যিনি দুইখণ্ডে *Kars* নামক একটি বৃহৎ উপন্যাস রচনা করেছিলেন, *Dveselu putenis* এর লেখক গ্রীনস্ এবং ছোটগল্প লেখক এৎসিরিন্সের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ মোলডাভীয় সাহিত্য ॥

মোলডাভীয় প্রজাতন্ত্র বা বেসারাবিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্ষুদ্রতম প্রজাতন্ত্র এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েট ইউনিয়নে যুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত বহু রাজনৈতিক পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে এই দেশটিকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে, যার ফলে এখানকার সংস্কৃতি মিশ্র আকার ধারণ করেছে। আদিতে মোলডাভিয়া ছিল সিথিয়ার একটি অংশ। কিছুকাল এই অঞ্চলে তাতারদের অধিকার স্থাপিত হয়েছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের পর বেসারাবিযা কিছুকাল রুশ অধীনে থাকে। পরে তা রুমানিয়ার অধিকারে আসে, এবং আরও পরবর্তীকালে তা আবার বিযুক্ত হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রুমানিয়ার পূর্বদিকের প্রদেশটির নামও মোলডাভিয়া, এবং উভয় মোলডাভিয়ারই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সঙ্গতভাবেই এক এবং অভিন্ন। মোলডাভীয় ভাষা রুমানীয় ভাষারই একটি আঞ্চলিক রূপ যা শ্লাভনিক ও ল্যাটিনের প্রভাবে গঠিত।

আদি পর্যায়ের মোলডাভীয় সাহিত্যের বিকাশ পূর্ব ইউরোপীয অপরাপর সাহিত্যের অনুরূপ পদ্ধতিতেই গড়ে উঠেছিল। ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় প্রকার সাহিত্যেরই বিকাশ দেখা গিয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের একটা বড় অংশই ছিল লোকযান, কাহিনী, কবিতা ও সঙ্গীতের আকারে যেগুলি সুপ্রাচীনকাল থেকেই লোক-মুখে আবর্তিত হয়েছিল, এবং পরবর্তীকালে শিক্ষিত মহলে আগ্রহ সৃষ্টির ফলে যেগুলি লিখিত আকার পেয়েছিল। এই সকল কবিতা

ও কাহিনী সমূহের মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই প্রাক্-খৃষ্টীয় প্যাগান ঐতিহ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে কবিতা, গদ্যসাহিত্য ও নাটকের ত্রিমুখী বিকাশ দেখা যায়। মোলডাভীয় কবিতার বিভিন্ন ধরণগুলির নাম যথাক্রমে *Doine* (প্রেমের কবিতা), *Bocete* (শোকগীতি), *Colinde* (ধর্মসঙ্গীত, ক্যারল) এবং *Cantece* (গীতিকবিতা)। আখ্যানধর্মী কাব্যসমূহকে বলা হত *Cantece Batranesti*। ধর্মগ্রন্থ ও লোককাহিনীসমূহ গদ্যে রচিত হত। নাটকের মধ্যে ছিল বাইবেলের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে রচিত সংলাপসমূহ।

মোলডাভীয়-রুমানীয় সাহিত্যে শ্লাভনিক ভাষাসমূহে রচিত ধর্মশাস্ত্রসমূহের অনুবাদ পঞ্চদশ শতক থেকেই শুরু হয়েছিল। সেই হিসাবে পূর্বে উল্লিখিত প্রাচীন রুশ সাহিত্যের কিছু কিছু অংশেরও অনুবাদ মোলডাভীয় সাহিত্যে দেখা যায়। মোলডাভিয়ার পশ্চিম প্রান্তে বর্তমান রুমানিয়ার ওয়ালাচিয়া অংশে ধর্মসংস্কার বা রিফর্মেশন আন্দোলনের তরঙ্গ এসে পড়েছিল। পক্ষান্তরে মোল-ডাভিয়া ছিল রক্ষণশীলদের দুর্গ। ওয়ালাচিয়া থেকে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে একটি ক্যালভিনপন্থীদের তাত্ত্বিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যেটির প্রতিপাদ্য সমূহকে খণ্ডন করে মোলডাভিয়ার মেট্রোপলিটান ভারলাম ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এরও পূর্বে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারলাম আরও একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, নাম *Cartea Remaneasca de Invatatura*, যা ধর্মীয় উপদেশ-মালার একটি সংকলন। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে *Pravila lui Vasili lupu*, অর্থাৎ মোলডাভিয়ার রাজকুমার 'ভাসিলি লুপুর আইনসমূহ' প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটি আবার ওয়ালাচিয়ায় রচিত আর একটি বৃহদায়তন আইনগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, যা রচিত হয়েছিল

১৮৭০) রুমানিয়ার ইতিহাস রচনা করেন যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ; এছাড়া তিনি ঘিয়োরঘি (জর্জি) সিনকাই-এর (১৭৫৩-১৮১৬) সহযোগিতায় প্রথম রুমানীয় ব্যাকরণ লেখেন। সিনকাই ঐতিহাসিক হিসাবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন, যাঁর *Hronica Romanilor* প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৭ সালে। ভাষা সংস্কারের পূর্বসর্ত হিসাবে বর্ণমালা সংস্কারের জন্য আন্দোলন করেছিলেন পেটরু মাইয়োর যিনি ল্যাটিন বর্ণমালা প্রবর্তনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে কোস্টাখি কোনাখি এবং এনাখি কোগালনিচেয়ানু ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কাব্যরীতির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তন যাঁরা এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য আইওন (জন) বুদাই দেলেনন যিনি *Tiganiada* নামক একটি ব্যঙ্গকাব্য লিখেছিলেন। বৃহদায়তন এবং মহাকাব্যের ধাঁচে লিখিত ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই কাব্যের নায়কনায়িকারা সকলেই ছিল জিপসী সম্প্রদায়ের। ভাসিলি আরণ (১৭৭০-১৮২২) দশ হাজার শ্লোকে *Patima si Moartea Domnului Isus Christos* নামক একটি মহাকাব্য খৃষ্টীয় আদর্শের বাতাবরণে রচনা করেছিলেন। ১৮০৫ সালে প্রকাশিত এই মহাকাব্যটি মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট অবলম্বনে রচিত। তাঁর *Priam si tisbi* (১৮০৮) ওভিডের মেটামরফসেসের অনুসরণ। হোমার এবং ওভিডের অনুবাদ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন আইওন বারাক (১৭৭৯-১৮৪৮) যাঁর রচিত *Risipirea Ierusalimului* এবং *Arghir si Elena* বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বোকোভানিয়া অঞ্চলটি অষ্ট্রিয়ার অধিকারে

যায়, এবং ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বেসারাবিয়া রুশিয়ার অধিকারে আসে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মোলডাভিয়ায় পূর্বকথিত ভ্যাসিলি লুপুর আইনের পরিবর্তে নতুন আইন প্রবর্তিত হয়। এই সময় থেকেই মোলডাভিয়া ও তার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে নতুনভাবে জাতীয় ভাবধারার বিকাশ ঘটে যার নেতৃত্ব করেন বিখ্যাত চিন্তাবিদ টুডোর ভলাডিমিরেশেন। ঘিয়োরঘি আশাখি (১৭৮৮-১৮৬৯) *Albina Romaneasca* নামক একটি সাময়িক পত্রেব প্রকাশ শুরু করেন ১৮২৮ থেকে যা নতুন ভাবধাবাসমূহের মুখপত্র হযে ওঠে। উনিশ শতকেব প্রথম দিকের মোলডাভীয় লেখকদের মধ্যে ডোনিকি রুশ ভাষা থেকে তাঁর স্বদেশ-বাদী আন্তিয়োথ কান্তেমিরের রচনাসমূহের অনুবাদ করেন। তাঁকে এই কার্যে, কান্তেমির রচিত বিপুল উপকথা ও ব্যঙ্গাত্মক কাহিনীসমূহের অনুবাদে সহায়তা করেছিলেন নেগ্রুৎসি। অপর একজন লেখক স্টামাটে যিনি ফরাসী ও রুশীয় রোমান্টিক ভাবধারায় দীক্ষিত হয়েছিলেন, ইংরাজী থেকে টমাস মুর এবং ওয়াল্টার স্কটের রচনাবলী অনুবাদ কবেছিলেন। এঁবা সকলেই বেসারাবিয়া অর্থাৎ বর্তমান সোভিয়েট মোলডাভিযাব অধিবাসী ছিলেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি যুগে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিদ্রোহী কবি আন্দ্রেই মুরেসান্নুর নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এ ছাড়া অপর একজন কবি বলিন্টিনেয়ান্নু ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। কিন্তু মধ্য উনিশ শতকে কবি হিসাবে যাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক তিনি ছিলেন গ্রীগুরে আলেক-জান্দ্রেস্কু (১৮১২-৮৫) যাঁর রচিত *Poezii* এবং *Meditaii* মোলডাভীয় তথা রুমানীয় সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এ ছাড়া তিনি লামার্তিনে, লার্ফতেন প্রভৃতি ফরাসী লেখকদের অনুকরণে প্রচুর শ্লেষাত্মক রচনা লিখেছিলেন, এবং ভলতেয়ার ও বায়রণের

রচনাবলীর অনুবাদ করেছিলেন। মধ্য উনিশ শতকের ঐতিহাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বালেস্কু (১৮১৯-৫৯) যিনি *Magazinul Istoric Pentru Dacia* নামক একটি ঐতিহাসিক পত্রিকার দীর্ঘকাল সম্পাদনা করেছিলেন। এ ছাড়া মিহাই কোগলানিকিয়ানু (১৮২৭-৮১) পুরাতন মোলডাভীয় ক্রনিকলসমূহ নূতন করে সম্পাদনা করেছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকের লেখকদের মধ্যে ভাসিলি আলেকজান্দ্রি (১৮২১-৯০) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি *Doine Si Lacrimioare* এবং *Suvenire Si Margaritarele* নামক দুটি কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৫৩ ও ১৮৫৬, *Buchetiera Din Florenta* নামক উপন্যাস এবং কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। এ ছাড়া প্রাচীন লোকগীতি সংগ্রাহক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল যেগুলি তিনি *Balade* এবং *Poezii Populare* গ্রন্থদ্বয়ে সংকলন করেছিলেন। কবি মিহাইল এমিনেস্কু (১৮৫০-৮৯) তাঁর *Poezii* কাব্যগ্রন্থ মারফৎ বিখ্যাত হয়েছিলেন। এ ছাড়া গল্পকার ও দার্শনিক হিসাবেও তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এমিনেস্কু ভারতীয় দর্শনের অনুরাগী ছিলেন।

॥ তুর্কী সাহিত্য ॥

তুর্কী এবং তুর্কীজাত ভাষাসমূহে প্রায় ছয় কোটি মানুষ কথা-বার্তা বলেন, যাঁদের মধ্যে আড়াই কোটি তুরস্কের বাসিন্দা, প্রায় দুই কোটি সোভিয়েট ইউনিয়নের, আশী লক্ষ চীন দেশের এবং আশী লক্ষ ইরান ও আফগানিস্তানের। তুর্কী ভাষা বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটির মধ্যেই এক আশ্চর্য ঐক্য লক্ষ্য করা যায়, শুধু ব্যতিক্রম চুভাষ এবং ইযাকুত, একান্ত-ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার দরুন যাদের সঙ্গে অপর ভাষাগুলির সংযোগ ছিল না। তুর্কীভাষার আদিতম নিদর্শন পাওয়া যায় অষ্টম শতকের কয়েকটি লেখমালায় যেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে মঙ্গো-লীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত ওরখান নদীর তীরে এবং সোভিয়েট দেশের ইয়েনিসি নদী অঞ্চলে। এগুলি রুনিক লিপিতে লিখিত যার সর্বপ্রথম পাঠোদ্ধার করেন ভিলহেলম থোমসেন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। এই লিপির উদ্ভব হয়েছিল আরামায়িক থেকে প্রাচীন সোগডীয় বর্ণমালার মারফৎ। কালক্রমে অবশ্য তুর্কী ভাষা উইগুর লিপিতে লিখিত হতে শুরু করে যার উদ্ভব সেমেটিক বর্ণমালা থেকে। দশম ও একাদশ শতক থেকে আরবীয় লিপি ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে যদিও প্রাচীন লিপিগুলি পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত কিপচক ও চাখতাই ভাষাদ্বয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। আরবীয় লিপিতে তুর্কী ভাষাসমূহ লিখিত হত বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্কে আরবীয় লিপির পরিবর্তে রোমক লিপির ব্যবহার

শুরু হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের আজারবাইজানে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ল্যাটিন (রোমক) লিপি প্রবর্তিত হয় এবং ১৯২৮ থেকে তা সোভিয়েট ইউনিয়নের অপরাপর তুর্কীভাষী অঞ্চলে প্রসারিত হয়। ১৯৩১ সাল থেকে সেখানে সিরিলীয় লিপি (যাতে রুশ ভাষা লিখিত হযে থাকে) প্রচলন হয় তুর্কীভাষার ক্ষেত্রে। আমরা পূর্বে দেখেছি যে আধুনিক তুর্কীভাষাগুলিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, দক্ষিণ-পশ্চিম বা তুর্কমেন শ্রেণী, দক্ষিণ-পূর্ব বা চাখতাই বা উজবেক শ্রেণী, উত্তর-পশ্চিম বা কিপচক শ্রেণী এবং উত্তর-পূর্ব বা উইগুর শ্রেণী।

আদিতম তুর্কী সাহিত্যের নিদর্শন যা রুনিক লিপিতে রচিত ও অষ্টম শতকের লেখমালাসমূহে পাওয়া গেছে তা তুর্কী রাজকুমার কিউল ও তাঁর ভাই বিলগে খানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছিল। তুর্কী ইতিহাসের গৌরবময় যুগ, চীনাদের নিকট তাদের অধীনতা, বিলগে খানের নেতৃত্বে তাদের মুক্তিলাভের কাহিনী এই ওরখান লেখমালায় উল্লিখিত হয়েছে। এই লেখমালাগুলির সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছিলেন ডি. রস, ১৯২৩ সালে বুলেটিন অফ এশিয়ান এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ পত্রিকায়। নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে রচিত উইগুর তুর্কীর কিছু নিদর্শন চৈনিক তুর্কীস্থানে পাওয়া গেছে। তুর্কী রচনার এইগুলিই আদিতম নিদর্শন।

যেগুলি বর্তমান তুর্কীভাষী অঞ্চল, সেগুলির বহুস্থানেই একদা বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। ভারতবর্ষ থেকে সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধমত সোভিয়েট মধ্য এশিয়ায় একদা প্রসার লাভ করেছিল, যার প্রচুর সাহিত্যগত ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। তুর্কী ভাষী অঞ্চলসমূহে ভারতীয় প্রভাবযুক্ত যে সকল রচনা পাওয়া গেছে সেগুলির অধিকাংশই

সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় রচিত, ব্রাহ্মী বা খরোষ্ঠী লিপিতে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরবর্তীকালে স্থানীয় তুর্কীভাষাতেও যে বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হয়নি তা নয়। অভিধর্মকোশের একটি তুর্কী অনুবাদের সন্ধান পাওয়া গেছে।

তুর্কী সাহিত্যের ভৌগলিক পরিমণ্ডল সুবিশাল। তুর্কীভাষার যে ধরণটি বর্তমান তুরস্কে প্রচলিত তা সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন কোন স্থানে আজও বর্তমান। কাজেই সোভিয়েট তুর্কী সাহিত্যের আদিপর্বের সূচনা করতে গেলে অনিবার্যভাবেই তুরস্কের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এছাড়া সার্বিকভাবে পারসিক সাহিত্যের প্রভাব তুর্কী সাহিত্যের উপর বর্তমান। সেলজুক তুর্কীদের সাম্রাজ্য পারস্য দেশেও বিস্তৃত হয়েছিল, যার ফলে উন্নততর পারসিক সাহিত্য তুর্কী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ হতে রীতিমত সাহায্য করেছিল। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে তুর্কী চেঙ্গিজ খানের পারস্য আক্রমণ মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সূচনা করেছিল। চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে তৈমুরের সাম্রাজ্য ইরাণ, তাতার, মধ্য এশিয়া সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তৈমুরের বংশধরগণ ভারতবর্ষেও তাঁদের সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে মুঘল সম্রাট বাবরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১০৭১ খৃষ্টাব্দে রচিত মাহ্‌মুদ কাশগরির অভিধানে আদি তুর্কী কাব্যসাহিত্যের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে বহু উদ্ধৃতি (দোর্তলুক) আছে যেগুলি বিভিন্ন ছন্দের ও বিভিন্ন বিষয়-বস্তু অবলম্বনে রচিত প্রাচীন কবিতার কিছু কিছু নিদর্শন হিসাবে সত্যই মূল্যবান। ইসলাম ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তুর্কীভাষার উপর আরবীয় ও পারসিক প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই পড়েছিল, বিশেষভাবে পারসিক সাহিত্যের। তুর্কী সাহিত্যের আদিযুগকে

প্রাক-ক্লাসিকাল যুগ বলা হয়। পূর্বোক্ত অভিধানটির সমকালীন, আনুমানিক ১০৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে রচিত ইউসুফ হাস হাকিব কৃত কুদাৎ-কু-বিলিক প্রাচীন তুর্কী সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অবদান হিসাবে গণ্য হতে পারে। এটি প্রাচীন উইগুর বাক্‌ধারায় রচিত, রচনাকাল আনুমানিক ১০৭০ খৃষ্টাব্দ। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে উজবেক বা চাখতাই তুর্কীর ঘনিষ্ঠতা বেশি। ইউসুফ হাস হাকিব ছিলেন কাশগরের সুলতানের কোষাধ্যক্ষ। ছয় হাজার শ্লোকে বিরচিত এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হচ্ছে রাষ্ট্রনীতি, যা একজন মন্ত্রী, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও তাদের একজন বন্ধুর কথোপকথনের মারফৎ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

আজারবাইজানের মহাকবি নিজামী গান্‌জেবি তুর্কী সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। নিজামীর জন্ম ১১৪২ খৃষ্টাব্দে গানজার নামক স্থানে, যার আধুনিক নাম কিরোভাবাদ। তাঁর জীবনকালে পারসিকদের সঙ্গে আজারবাইজানের সংঘর্ষ চলছিল, যার প্রভাব তিনি নিজেও এড়াতে পারেননি। নিজামী ছিলেন মানবপ্রেমিক কবি। তাঁর পাঁচটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম—'রহস্যভাণ্ডার', 'খসরু-শিরিণ', 'লাইলা-মজনুন', 'সপ্তসুন্দরী' এবং 'সেকান্দর-নামা।' আজেরি তুর্কীতে রচিত নিজামীর কাব্যসমূহ পরবর্তীকালের অসংখ্য তুর্কী কবিকে প্রেরণা দিয়েছে, তাঁর এই পঞ্চকাব্যের আখ্যানভাগ অবলম্বনে অনেকেই কাব্য রচনা করেছেন, পরবর্তীকালের কবিদের রচনায় এ কথার স্বীকৃতিও আছে। নিজামী মারা যান ১২০৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর কাব্যসমূহ ও সেগুলির অনুবাদ নূতন করে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে আজারবাইজানের প্রধান নগর বাকু থেকে, তাঁর অষ্টম জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে। নিজামীর রচনা ছাড়া, আজেরি

তুর্কী দুটি মহাকাব্যের দাবিদার। প্রথমটির নাম ওঘুজ-নামা, যা রাজা ওঘুজ ও তাঁর পুত্রদের দিগ্বিজয়ের কাহিনী। দ্বিতীয়টির নাম কিতাব-ই-দেদে-কোরকুৎ যাতে আছে বারোটি উৎকৃষ্ট কাহিনী। প্রতিটি কাহিনীই উপদেশমূলক এবং সেগুলি তাদের প্রবক্তাদের নামেই কথিত। আজেরি সাহিত্যের অপরাপর নিদর্শনের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হবে।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে মধ্য এশিয়ায় মঙ্গোল আধিপত্য ও তৈমুরীয় যুগের সূত্রপাত হচ্ছিল যেমন একদিকে, অপরদিকে তেমনি দক্ষিণ দিক থেকে পারসিক প্রভাবও প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছিল। উন্নততর পারসিক সভ্যতার প্রভাব তুর্কী কাব্যসাহিত্যের উপর বিশেষভাবে পড়েছিল। পারসিক সাহিত্যে তখন সুফী কবিদের প্রাধান্য চলছে। সেখানে তখন সাদী (১১৮৪-১২৯১), কামাল-উদ্দীন ইসমাইল (মৃত্যু ১২৩৭) এবং জালালুদ্দীন রুমী (১২০৭-৭০) প্রভুত্ব করছেন। জালালুদ্দীন রুমীর পুত্র সুলতান বেলেদ তুর্কী সাহিত্যের একজন মুখ্য কবি হিসাবে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। জালালুদ্দীন পারসিক ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পুত্র বেলেদ কিন্তু তুর্কী ভাষাকেই নিজের সাহিত্যসাধনার ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বেলেদ রচিত অতীন্দ্রিয়বাদী কবিতা-সমূহ প্রাচীন তুর্কী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। তাঁর রচিত বেলেদ-নামা কাব্যে (রচনাকাল ১২৮১ খৃষ্টাব্দ) তাঁর পিতা ও অন্যান্য সাধকদের জীবন-সম্বলিত সুফীতত্ত্বের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কথিত আছে, তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক কথিত মসনবী-মনবীর সপ্তম খণ্ড সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু তার কোন নিদর্শন বর্তমানে পাওয়া যায় না। তুর্কী সাহিত্যের পরবর্তী অতীন্দ্রিয়বাদী কবির নাম আশিক পাশা, যাঁর গভীর ভাবমূলক

রচনাসমূহ তাঁকে বেলেদের পাশেই স্থান দিয়েছে। আজেরি কবি নেশিমিও (মৃত্যু ১৪২০) ওই একই ধারার ধারক ছিলেন, যাঁকে রাজদ্রোহের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে কিরমিযানের শেইখি খসরু ও শিহ্‌রিণের প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। খসরু ও শিহ্‌রিণের কাহিনী বহু প্রাচীন এবং তা পারসিক সাহিত্য থেকে সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছিলেন নিজামী যাঁর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। শেইখির রচনায় নিজামীর প্রভাব যথেষ্ট। ওই একই সময়ে ইযাজ্জিজি ওখলু হজরত মোহম্মদের জীবনী অবলম্বনে 'মুহম্মদীয়া' কাব্য রচনা করেন, এঁরা উভয়েই তুরস্ক সাম্রাজ্যের এলাকায় বাস করতেন। পঞ্চদশ শতকের অপরাপর তুর্কী রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনৈক শেখজাদা রচিত 'চল্লিশ ভজিরের ইতিহাস'। সুলতান 'বিজয়ী' মোহম্মদের জনৈক মন্ত্রী সিনান পাশা (মৃত্যু ১৪২০) তাজার-রুয়াৎ নামক একটি গ্রন্থ গদ্যে রচনা করেন। এই রচনাটির চরিত্র ধর্মীয়। ওই সময়ে কামাল পাশা-জাদা নামক জনৈক আইনজ্ঞ ইউসুফ ও জুলেইখার বিখ্যাত প্রণযোপাখ্যান অবলম্বনে তুর্কী ভাষায় একটি অনবদ্য কাব্য রচনা করেন। এ ছাড়া তিনি সাদীর গুলিস্তান অনুসরণে নিগারিস্তান নামক আরও একটি জনপ্রিয় কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যটি গদ্য ও কবিতা মিশ্রিত, এবং এর প্রতিটি অধ্যায়ই সুন্দর সুন্দর উপদেশমূলক গল্পের দ্বারা সজ্জিত।

পঞ্চদশ শতকের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের মীর আলি শের নবায়ী, যিনি তুর্কী সাহিত্যে চিরস্থায়ী গৌরবের আসন অধিকার করেছিলেন। গজ্‌ল-সম্বলিত চারটি 'দিওয়ান' এবং বিখ্যাত পারসিক মসনবী কবিতার বিষয়বস্তু অবলম্বনে ছয়টি

মসনবী কাব্যও রচনা করেছিলেন। মসনবী হচ্ছে দুই পংক্তি ছন্দোযুক্ত কবিতা যা ঐতিহাসিক ঘটনা বা বীরত্বপূর্ণ কাহিনী প্রকাশ করার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। পারসিক সাহিত্যে বহু কবিই মসনবী কবিতা লিখেছেন। 'দিওয়ান' শব্দটির অর্থ গ্রন্থ। নবায়ীর আরও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে তাঁর সমসাময়িক কবি ও সাহিত্যিকদের জীবনী সংগ্রহ। এই গ্রন্থটি পরবর্তীকালে শাহ্-আলী কর্তৃক মজালিসুল-নফায়েস নামে পারসিক ভাষায় অনূদিত হয়। নবায়ী ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে হিরাটে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ১৫০১ খৃষ্টাব্দে মারা যান। কবিতা রচনা ছাড়াও সঙ্গীতে ও চিত্র-শিল্পেও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়ে ছিলেন। তিনি 'ফানি' ছদ্মনামে পারসিক ভাষাতেও কবিতা লিখতেন, এবং বিখ্যাত পারসিক কবি মৌলানা জামি-র একজন বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পঞ্চাশ হাজার শ্লোকে তাঁর রচিত 'হামজা' (পঞ্চাধ্যায়ের কাব্য) তাঁর কবিত্ব, দার্শনিকত্ব ও মানবপ্রেমের অনন্য অবদান হিসাবে স্বীকৃত। বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নে নবায়ী বিশেষভাবে স্বীকৃত, ১৯৪৮ এ বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর পঞ্চম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাসখন্দের প্রধান রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাগৃহের নাম নবায়ী-অপেরা। উজবেকিস্তানের বহু প্রতিষ্ঠানেরই নামকরণ তাঁর নামে করা হয়েছে।

ষোড়শ শতক থেকে তুর্কী কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে যুগের সূত্রপাত হয় তা ক্লাসিকাল যুগ নামে পরিচিত। এই যুগের তুর্কী কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ফুজুলি (মৃত্যু ১৫৬৩)। ফুজুলির কবিতার মধ্যেও পারসিক প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্তমান, তবে তিনি বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাতন্ত্র রক্ষা করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত 'শিকায়ৎনামা' যা সম্রাট সুলেমানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, আজেবি তুর্কী সাহিত্যের একটি বিশেষ নিদর্শন। এ ছাড়া বিখ্যাত

লায়লা মজনুনের প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে তিনি একটি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ফুজুলির সমুদয় কবিতা বা দিওয়ান ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে 'কুল্লিয়াৎ-ই-ফুজুলি' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে একটি ফুজুলি-স্মারক-গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। ষোড়শ শতকে আজেরি তুর্কীর আরও একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন পারস্যের সাফাইদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাই-ইসমাইল (মৃত্যু ১৫২৪) যিনি 'হাতাই' এই ছদ্মনামে ধর্মমূলক কবিতা লিখেছিলেন। ধর্মমতের দিক থেকে তিনি ছিলেন শিয়া। ফুজুলির প্রতিদ্বন্দী ছিলেন কনস্টান্টিনোপলের বাকী (মৃত্যু-১৫৯৯)। মূলত প্রশস্তিমূলক কবিতার জন্য তিনি বিখ্যাত, এবং সেগুলির মধ্যে সম্রাট প্রথম সুলেমানকে নিবেদিত একটি কাসীদ অতুলনীয়।

ষোড়শ শতকে চাঘতাই বা উজবেক শ্রেণীর তুর্কীতে রচিত হয়েছিল 'বাবুর নাম' যা সমগ্র তুর্কী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বেভারিজের ইংরাজী অনুবাদের ফলে গ্রন্থটি সহজলভ্য। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তৈমুর বংশোদ্ভূত জহিরুদ্দীন বাবুর বিরচিত এই আত্মজীবনীকে সেই যুগের সারা মধ্য এশিয়ার নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বলা যেতে পারে। জ্ঞাতি শত্রুদের চক্রান্তে নির্বাসিত এই রাজপুত্র ভাগ্যের সন্ধানে এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত ভারতের উত্তর পশ্চিমে একটি রাজত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু ভারতকে তিনি কোনদিনই আপন বলে মনে করতে পারেননি। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁর হৃত রাজধানী সমরকন্দের প্রতি যেখানে তিনি কোন দিনই ফিরে যেতে পারেননি। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে রচিত এই আত্মজীবনীতে তিনি বিভিন্ন তুর্কী গোষ্ঠীর সামাজিক জীবন,

রাজনৈতিক পরিবেশ, সমস্ত কিছুই নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, তাঁর পিতা-পিতামহের কথা, পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন। বাবুরের এই আত্মজীবনী গদ্যে রচিত হলেও, তুর্কী কবিতার ইতিহাসে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাবুর নিজেই শুধু কবি ছিলেন না, কবি ও কবিতার অনুরাগী ছিলেন। মধ্য এশিয়ার অনেক তুর্কী কবি তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছেন। শুধু তুর্কী কবিতার ক্ষেত্রেই নয়, বাবুরের সহৃদয়তা পারসিক সাহিত্যের প্রতিও সম্প্রসারিত ছিল। তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর সমসাময়িক পারসিক কবি ও সাহিত্যিকদের উদ্ধৃতি বর্তমান।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের তুর্কী সাহিত্যে আরও যাঁরা কবি-খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ফুহী, লামী, নেভী, ইহায়া বেগ, এবু স্থদ, দ্বিতীয় সালেম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছাড়া এরজে-রামের নেফী কাসীদ রচনার জন্য বিখ্যাত। তুর্কী গজ্লের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন করেন নাবী (মৃত্যু ১৭১২), যাঁর গজ্লসমূহ পরবর্তী রচনাকারদের আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যায়ের কবি নেদীম, যাঁকে দিয়ে তুর্কী সাহিত্যের ক্লাসিকাল যুগের অবসান হয়। সপ্তদশ শতকের তুর্কী সাহিত্য ঐতিহাসিক ও অপরাপর রচনার দ্বারাও সমৃদ্ধ হয়েছিল। এই সকল রচনার মধ্যে উজবেক তুর্কীতে রচিত স্কেচেরে-ই-তুর্ক অর্থাৎ 'তুর্কীদের বংশাবলী' বিখ্যাত, যেটি রচনা করেছিলেন এবুলগাজি বাহাদুর হান, যিনি পরলোকগমন করেছিলেন ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে। ইতিহাসমূলক অপরাপর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আল্লি চেল্লেবি রচিত 'হুমায়ুননাম' যা আসলে হুসেন কাশিফী রচিত পারসিক অন্‌বার-ই-সুহ্‌য়লী গ্রন্থের তুর্কী অনুবাদ। পরবর্তী

উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে সাদ উদ্দীন বিরচিত তাজ-উৎ-তেবারিক যা আসলে ষোড়শ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর বর্ণনা, এবং সাদ-উদ্দীনের উত্তরাধিকারী নঈমা এই বিবরণটিকে এগিয়ে নিয়ে যান ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সপ্তদশ শতকের অপরাপর রচনার মধ্যে এভেলিযা রচিত ভ্রমণ কাহিনী, আতাউল্লা রচিত জীবনী সংগ্রহ, এবং পণ্ডিত প্রবর হাজী খলিফাব বিভিন্ন জাগতিক বিষযের উপর রচিত গ্রন্থাবলী উল্লের্খযোগ্য। পারসিক প্রভাব কোনদিনই তুর্কী সাহিত্য থেকে চিরতরে অবলুপ্ত হযনি, বেযেসী রচিত 'প্রেরিত পুরুষেব জীবনী' এবং নের্গিশীব বচনাবলীতে তাব বিশেষ প্রভাব আছে। তুর্কী ভাষায় ছাপা অক্ষবের প্রচলন শুরু হয ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে এবং প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থটি হচ্ছে কেভেরির আরবীয় অভিধানের বংকুলি কৃত তুর্কী অনুবাদ।

॥ সোভিয়েট দেশে ভারততত্ত্ব চর্চা ॥

ভারত সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ আমরা পাই ত্রয়োদশ শতকের একটি রুশ রচনায় যার নাম *Skazanye indiskom tsarstve*, অর্থাৎ 'ভারতীয় সাম্রাজ্যের কাহিনী' যেখানে ভারতবর্ষে একটি শক্তিশালী খৃষ্টান রাজত্বের অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়েছে, যার রাজা বাইজানটাইন সম্রাট ইমানুয়েলের নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন। এই গ্রন্থটি পূর্বে উল্লেখ করার সুযোগ আমাদের হয়েছে (রুশ সাহিত্য দ্রষ্টব্য)। সেখানে আমরা বলেছি যে সম্ভবত ওই সময় রুশিয়ায় খৃষ্টধর্ম বিপন্ন হয়েছিল এবং সেক্ষেত্রে রুশিয়ার বাইরে কোন শক্তিমান খৃষ্টান রাজ্যের অস্তিত্বের কল্পনা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা সান্ত্বনাস্বরূপ ছিল। এছাড়া রুশীয় লোকসাহিত্যে ডিউক স্টেপানোভিচের কথা আছে, যিনি নাকি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন।

ভারত সম্পর্কে দ্বিতীয় বিবরণ পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতকের আফানাসিয়া নিকিতিনা বিরচিত *Khozhdenie za tri morya* অর্থাৎ 'তিন সাগরের ওপার' নামক গ্রন্থে। নিকিতিনা ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং চার বছর এখানে ছিলেন। তাঁর গ্রন্থে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের, কিছু মনোজ্ঞ বিবরণ আছে। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডার মিথায়েলোভিচ ভারতের সঙ্গে রুশিয়ার বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার সেণ্টপিটার্সবার্গে অ্যাকাডেমি অফ্

সায়েন্স গঠিত হয়, এবং তার প্রথম অ্যাকাডেমিশিয়ান তোয়েফিল ৎসীগফ্রীড বেয়ার (১৬৯৪-১৭৩৮) যথাক্রমে ১৭৩২ ও ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর দুটি গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকারণ ও সাহিত্যের উপর কিছু আলোচনা করেন। সংস্কৃত ছাড়াও তিনি তামিল ও তেলেগু, এবং মারাঠী ও গুজরাতী কিয়ৎপরিমানে শিক্ষা করেছিলেন। জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে রুশ ভাষায় একটি সংস্কৃত রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই লেখক সংস্কৃত জানতেন না, তিনি আগাগোড়া সংস্কৃতকে গণস্কৃত বলেছেন, এবং তাঁর অনুবাদ নিঃসন্দেহে কোন অনুবাদের অনুবাদ। এ ছাড়া সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আজ্ঞায় ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পি. এস. পাটাশা সম্পাদিত একটি অভিধানে কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বহু সংস্কৃত রচনাকে রুশ ভাষায় অনূদিত হতে দেখা যায়। অবশ্য প্রত্যক্ষ অনুবাদ নয়, অপরাপর ইউরোপীয় ভাষা থেকে অনুবাদ। চার্লস উইলকিন্স কৃত ভগবদ-গীতার ইংরাজী অনুবাদের (১৭৮৫) রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে, সার উইলিয়ম জোনস কৃত কালিদাসের শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদের প্রথম ও চতুর্থ অংকদ্বয়ের রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এবং এন. এম. কারামজিন কৃত অবশিষ্ট অংক-গুলির অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এন. বি. চেম্নপানভ ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক একটি গ্রন্থ জার্মান থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যা ছিল মূল্যবান।

প্রথম রুশভাষী, যিনি সত্যকার সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তিনি হচ্ছেন হেরাসিম স্তেফানোভিচ লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭), যিনি সুদীর্ঘ বারো বছর কাল ভারতবর্ষে ছিলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি

মাদ্রাজে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা শেখেন, এবং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এসে বাংলা ও হিন্দুস্তানী ভাষা আয়ত্ত করেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা-শুরু করেন। বাংলায় তিনি দুটি ইংরাজী নাটকের ভাবানুবাদ করেছিলেন, যা ভারতে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় প্রথায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৮০১ সালে তিনি লণ্ডনে যান যেখান থেকে তিনি পূর্বভারতীয বিশুদ্ধ এবং মিশ্র ভাষাগুলির একটি ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি রুশিয়ায় ফিরে যান এবং রাজকীয় অর্থানুকূল্যে সেখানে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। তিনি নিজেই বাংলা ও দেবনাগরী হরফ এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে নেন। তাঁর কয়েকটি রচনা ১৮০৬-৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় যেগুলিতে সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা আছে।

খারকোভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আই. রিৎস্কি জার্মান ভাষা থেকে ১৮০৬-৭ খৃষ্টাব্দে কিছু সংস্কৃত গ্রন্থের রুশ অনুবাদ করেন। ১৮০৬ এর থেকে ১৮০৯ এর মধ্যে রচিত এন. আই. আলবোর্দা-কৃত সংস্কৃত রুশ একটি গ্লসারির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে যা রুশ দেশের সংস্কৃত চর্চ্চার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রুশিয়ার সেণ্ট পিটার্সবার্গ নগরীই ছিল প্রাচ্যবিদ্যাচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র। ব্যাপকভাবে প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন অ্যাকাডেমিশিয়ান জি. এফ. কের (১৬৯২-১৭৪০), যিনি এই বিষয়ে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে একটি পরিকল্পনাও পেশ করেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কাউণ্ট উবারোভ এই বিষয়ে কিছুটা অগ্রণী হয়েছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে প্রাচ্য-ভাষাসমূহ শিক্ষার জন্য একটি ফ্যাকালটি গঠিত হয, যার ভারপ্রাপ্ত হন এফ. আদেলুঙ্গ (১৭৬৮-১৮৪২) যাঁর রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের একটি সমীক্ষা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে প্রকাশিত

হয়। আদেলুঙ্গ অনেক সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী অ্যাকাডেমিশিয়ান একস. ডি. ফ্রেন (১৭৮২-১৮৪৭) আরও অনেক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। সেণ্ট পিটার্স-বার্গ প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বি. এ. ডোর্ন (১৮০৫-৬১), ওয়াই. আই স্কিমড্‌ট (১৭৯৯-১৮৪৭), এ. এ. শিফনার (১৮১৭-১৮৭৯) প্রভৃতিরা প্রাচ্যবিদ্যার অপরাপর শাখায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন।

রবার্ট ক্রিস্টিয়ানোভিচ লেনৎস (১৮০৮-৩৬), ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ বপের কাছ থেকে সংস্কৃত শিক্ষা করেন, লণ্ডন ও প্যারিসের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সংস্পর্শেও তিনি আসেন। এশিয়াটিক মিউজিয়ামে কর্মরত অবস্থায় তিনি সেখানে রক্ষিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিসমূহের একটি বর্ণনামূলক ক্যাটালগ প্রস্তুত করেন। তাঁর গবেষণাসমূহ ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃত চর্চায় আগ্রহ সৃষ্টি এস. এস. উদর নামক একজন সরকারী কর্মচারীর প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখযোগ্য, যিনি একটি এশিয়াটিক অ্যাকাডেমি সৃষ্টির প্রস্তাব করেছিলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষার একটি সিলেবাসও প্রস্তুত করেছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-মন্ত্রীর পদ লাভ করে তাঁর পরিকল্পনাকে কিয়দংশে সার্থক করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বিচিত্র সম্ভারের প্রতি আকর্ষণ শুধু পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, রুশ কবি-রাও এই বিসয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কবি ঝুকোভস্কোভ মহাভারতের নল দময়ন্তীর কাহিনীটির রুশ অনুবাদ করেন, অবশ্য মূল থেকে নয়, জার্মান অনুবাদ থেকে। এই অনুবাদটি রুশিয়ায় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ভগবদগীতার অনেকগুলি অনুবাদ রুশ ভাষায় হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে বেলেনেকোভ কৃত অনুবাদটি ছিল

প্রত্যক্ষভাবেই সংস্কৃত থেকে করা।

রুশিয়ায় সংস্কৃতচর্চ্চার ক্ষেত্রে তিনি নবদিগন্তের উন্মোচন করেন তাঁর নাম পাবলো ইয়কোবলেভিচ পেত্রোভিচ, সংক্ষেপে পেত্রোভ (১৮১৪-১৮৭৫)। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মস্কো বিশ্ববিদ্যালযের স্নাতক হবার পর পেত্রোভ আরবীয়, পারসিক ও তুর্কীভাষা শিক্ষা করেন, এবং অতঃপর সংস্কৃতচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বন্ধু, রুশ সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক বেলিনস্কি লিখেছেন যে পেত্রোভ ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান ও ইংরাজী মোটামুটি জানতেন, এবং গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তাঁর প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পেত্রোভ সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। সংস্কৃত শিক্ষার সময় তিনি আদেলুঙ্গ ও ফ্রেনের কাছ থেকে রীতিমত উৎসাহ পান, এবং উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রথমে জার্মানীতে ও পরে ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। উল্লেখযোগ্য যে নিছক সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অধ্যাপক পদ রুশিয়ায় এই প্রথম। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকাকালীন পেত্রোভ সংস্কৃত শিক্ষাদানের একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করে। পেত্রোভ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

কাজান বিশ্ববিদ্যালযে পেত্রোভের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন এফ. বেলেনজেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্র খোলার ফলে কাজান এবং ওডেসা বিশ্ব-বিদ্যালয়দ্বয়ের ওই বিভাগটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৫৮ সাল থেকে সেখানে সংস্কৃত পড়ানোর সূত্রপাত হয়। প্রথম সংস্কৃতের

অধ্যাপকরূপে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন কে. এ. কোসোভিচ (১৮১৫-১৮৮৩), যাঁর কথায় আমরা পরে আসছি।

লেনৎস-এর নিকট দু বছর শিক্ষালাভের পর বি. এ. ডোর্ন (১৮০৫-৮১) কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতিরেকেই সংস্কৃত শিখেছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত ও শ্লাভনিক ভাষা-সমূহের সাদৃশ্য প্রদর্শন করে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। ১৮৩৯-এ তিনি বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন, এবং ১৮৪২ সাল পর্যন্ত সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্য-ভাষাসমূহের ফ্যাকালটির কর্মকর্ত্তা এম. মুসিন-পুস্কিন, যিনি ইগোর গাথার সংকলক রূপে প্রসিদ্ধ, তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা এ. নোরোভের নিকট প্রস্তাব করেন যে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার জন্য একটি অধ্যাপক পদের প্রয়োজন, এবং ওই পদটি তিনি পেত্রোভকে দেবার জন্য সুপারিশ করেন। যে কোন কারণেই হোক পেত্রোভকে এর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

আগেই বলা হয়েছে, ১৮৫৮ সাল থেকে কোসোভিচ সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে যোগদান করে-ছিলেন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পাঠ সমাপ্ত করে কোসোভিচ দর্শন ও গ্রীকভাষা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ক্রমশ তাঁর দৃষ্টি প্রাচ্যবিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি স্বাধীনভাবে হিব্রু, আরবীয়, পারসিক ও সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি খারকোভ বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক পদে আসীন হন। অল্পকাল পরেই তিনি সংস্কৃতে অধিকতর দক্ষ হবার উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করেন। কোসোভিচের রচনার সংখ্যা অজস্র। তাঁর রচনাবলীর একটি অংশ সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থের রুশ অনুবাদ, যেগুলি রুশিয়ার বিদগ্ধ মহলে

সংস্কৃতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাবলী সংস্কৃত শিক্ষার সহায়ক হিসাবে লিখিত হয়েছিল। তাঁর অপরাপর রচনা ভাষাতত্ত্বের উপর, যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রুশ-সংস্কৃত অভিধান', যার মাত্র তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল।

ক্রমশ সেণ্ট পিটার্সবার্গ আন্তর্জাতিক ভারততত্ত্ব চর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিতবর্গ এখানে সমবেত হয়েছিলেন। বিখ্যাত জার্মান ভারততত্ত্ববিদ অটো বোট-লিংক (১৮১৫-১৯০৪) এখানে যোগদান করেন এবং রুডলফ রোটের সহযোগিতায় একটি পর্বত প্রমাণ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন (১৮৫২-৭৫) যা 'সেণ্ট পিটার্সবার্গ ডিক্‌সনারী' নামে খ্যাত। এই অভিধানটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণও প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৯-এর মধ্যে। এই অভিধানটি সমগ্র ইউরোপেই সংস্কৃত চর্চার পথ সুগম করে দেয়। সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের উপর বোটলিংক বিশেষ চর্চা করেছিলেন, পাণিনির ব্যাকরণের উপর তাঁর কাজ জগদ্বিখ্যাত। এ ছাড়া তিনি বোপদেবের ব্যাকরণ হেমাদ্রির অভিধান, কয়েকটি উপনিষদ ও শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের ভাষান্তর করেন। ভারততত্ত্ব চর্চার উদ্দেশ্যে সেণ্ট পিটার্সবার্গ ও অন্যত্র বিশেষ ধরণের সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে, এবং পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সংস্কৃতের সূত্র ধরেই প্রাকৃত ও অপরাপর ভারতীয় ভাষা সমূহের চর্চা শুরু হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠ্যসূচী গৃহীত হবার পর পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা দেখা গিয়েছিল সেগুলির নিরসন কল্পে বড় বড় পণ্ডিতদের নিয়ে ভাষাতত্ত্বের একটি উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র চালু করা হয়।

বৌধধর্ম ও বৌদ্ধসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন অধ্যাপক ভি. পি. ভাসিলেভ (১৮১৮-১৯০০) এবং অধ্যাপক

ই. পি. মিনায়েভ। তিব্বতী এবং চৈনিক ভাষায় ভাসিলেভের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং অসংখ্য মহাযানী বৌদ্ধ গ্রন্থ যেগুলির সংস্কৃত মূল বিলুপ্ত হয়েছিল সেগুলির চৈনিক অনুবাদ তিনি সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছিলেন যা থেকে মূলগ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু ভারততত্ত্ব-বিদদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হতে পেরেছিল। লামা তারনাথ কৃত ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গ্রন্থের একটি রুশ সংস্করণ তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের অপর বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাঁর শিষ্য ই. পি. মিনায়েভ (১৮৪০-১৮৯০), যিনি ভারততত্ত্বের অপরাপর শাখা-সমূহেও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। ভাসিলেভের নিকট থেকে চৈনিক ভাষা ও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির উপর পাঠ নেবার পর তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোসোভিচের নিকট থেকে সংস্কৃত শিক্ষা করেন, এবং এই বিষয়ে অধিকতর শিক্ষার জন্য তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ যাত্রা করেন। ১৮৬৯-এ রুশ দেশে ফিরে এসে তিনি প্রাচ্যভাষা ফ্যাকাল্টিতে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৭১-এ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রথম অধ্যাপক হন, এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কোসোভিচের মৃত্যুর পর তাঁর পদাভিষিক্ত হন। মিনায়েভের কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পালি ভাষার একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন, এ ছাড়া ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের উপর বিভিন্ন ধরণের গবেষণার তিনি ছিলেন উদ্যোক্তা। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন, এবং এই সকল স্থান থেকে প্রচুর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলির অনুবাদ ও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ ছাড়া ভারতীয় লোকযানের উপর তাঁর আগ্রহ ছিল, এবং তার বহু উপাদান তিনি সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ভূগোল, বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি

বিষয়বস্তুর উপর তিনি কাজ করেছিলেন। বৈদিক সাহিত্য ও রামায়ণ-মহাভারত থেকে অংশ বিশেষ রুশ ভাষায় অনুবাদও করেছিলেন। তাঁর ভারত ভ্রমণের ডায়েরীটিও চিত্তাকর্ষক ও তথ্যবহুল।

মিনায়েভের শিষ্যবর্গের মধ্যে ডি. আই কুদরায়াভস্কি ভাষাতত্ত্বের উপর মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি প্রাচীন ভারতীয় আচার-অনুষ্ঠানেব উপরও কাজ করেছেন। 'হিতোপদেশের' রুশ অনুবাদের মূলেও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। দ্বিতীযজন, এন. ডি. মোরানভ মূলত বৈদিক সাহিত্যের উপরই তাঁর কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। রুশ বিশ্বকোষে তিনি ভাবতের উপর অনেক প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। মিনায়েভের অপর শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন সের্গেই ওল্‌ডেনবুর্গ (১৮৬৩-১৯৩৪) ও ফীডর (থিওডর) শেরবাটস্কি (১৮৬৬-১৯৪২)। রুশ ভারততত্ত্ব চর্চার এক্ষেত্রে এই দুজনের অবদান অপরিসীম। ওল্‌ডেনবুর্গ ছোট বড় মিলিয়ে শ'চারেক রচনা ভারততত্ত্বের উপর করেছিলেন, এবং রচনার বিষয়বস্তু ছিল বহু ও বিচিত্র, যেগুলির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মেব ইতিহাস, জাতক, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পেব ইতিহাস, সব কিছুই ছিল।

ওল্‌ডেনবুর্গের প্রিয় বিষয় ছিল মহাভারত যার উপর মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি শুধু পঠন-পাঠন ও গবেষণা কার্যেই লিপ্ত ছিলেন। সংগঠক হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল বহুমুখী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তিনি লেনিনের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৯০৪ থেকে ১৯২৩, এই একটানা পঁচিশ বছর তিনি রুশিয়ার বিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদক ছিলেন, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ এই চার বছর প্রাচ্যবিদ্যা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। শেরবাটস্কির সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৌদ্ধধর্ম চর্চার উদ্দেশ্যে তিনি

বিজ্ঞান-পরিষদের তরফ থেকে বিবলিওথেকা বুদ্ধিকা সিরিজে গ্রন্থ প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন ১৮৯৭ সাল থেকে। বিভিন্ন মূল বৌদ্ধগ্রন্থ এবং সেগুলির অনুবাদ প্রকাশ করাই ছিল বিবলিওথেকা বুদ্ধিকা সিরিজের উদ্দেশ্য। এই সিরিজে মোট তিরিশ খণ্ড গ্রন্থের প্রকাশ ঘটেছিল। ১৯৩৬ সালে, তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পর এই সিরিজের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি আবার তা চালু হয়েছে।

মিনায়েভের অপর শিষ্য ফীডর শেরবাটস্কি পৃথিবীর প্রথম সারির ভারততত্ত্ববিদদের মধ্যে একজন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন শেষ করার পর তিনি জার্মানীতে বুলার এবং ইয়াকোবির নিকট ভারততত্ত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করেন, এবং অল্পকালের মধ্যেই চৌকশ ভারততত্ত্ববিদ হিসাবে গণ্য হন, তবে বিশেষভাবে তিনি বৌদ্ধদর্শন, বিশেষ করে তার নৈয়ায়িক দিকসমূহই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মঙ্গোলিযা পরিভ্রমণ করেন, তিব্বতে যাবার ইচ্ছাও তাঁর খুব ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা সম্ভবপর হয়নি, যদিও তিনি পরে দলাই লামার সঙ্গে সম্পর্কে এসেছিলেন এবং তাঁর অনুরোধে বহু তিব্বতী গ্রন্থের রুশ অনুবাদও করেছিলেন। ১৯১০-১১ সালে শেরবাটস্কি ভারতে আসেন প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় পুঁথিপত্র ও জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। যদিও সে রকম পণ্ডিত তখন দুর্লভ ছিল, তাহলেও তিনি একজন মৈথিলী পণ্ডিতকে বোম্বাইতে পেয়েছিলেন। তাঁর ভারত ভ্রমণ সম্পর্কিত একটি রচনায তিনি বলেছেন যে এই পণ্ডিতের সঙ্গে তিনি একটি বাড়িতে একা থাকতেন, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিদ্যালোচনা চলত, আর তাঁরা কথা বলতেন সংস্কৃত

ভাষাতেই, কেননা ওই পণ্ডিত কোন ইউরোপীয় ভাষা জানতেন না। শুধু অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনেই বিদ্যালোচনা বন্ধ থাকত। তাঁর কাছ থেকে শেরবাটস্কি ন্যায়শাস্ত্র উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। অতঃপর শেরবাটস্কি বারাণসী ও কলকাতায় কিছুকাল থাকেন। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি বহু পুঁথি সংগ্রহ করেন। কলকাতায় তাঁকে একটি বিশেষ সভায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং ওই সভায় তাঁকে তর্কভূষণ উপাধি দেওয়া হয় ১৯১০ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ইংরাজ লেখক এডওয়ার্ড ডেনিসন রস ওই সভা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে ওই সভায় অনেক সংস্কৃতজ্ঞের সমাবেশ ঘটেছিল। শেরবাটস্কি যেমন সহজ ভঙ্গীতে সংস্কৃতে কথা বলছিলেন ওঁরা সেভাবে পেরে উঠছিলেন না, কিন্তু যখন সতীশ বিদ্যাভূষণ আলোচনায় যোগ দিলেন তখন সকলেই বেশ সহজ হয়ে উঠলেন। ভারতের বহু পণ্ডিত ও মণীষীর সঙ্গে শেরবাটস্কির পত্রালাপ ছিল, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, দেবদত্ত ভাণ্ডারকর, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ধর্মানন্দ কোধশম্বী, বিমলাচরণ লাহা, নরেন্দ্রনাথ লাহা, গঙ্গানাথ ঝা, রঘুবীর, পি. এল বৈদ্য, নলিনাক্ষ দত্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রভৃতি। ভারততত্ত্বে শেরবাটস্কির অবদান অতুলনীয়। তাঁর বিখ্যাত রচনাসমূহের মধ্যে দুইখণ্ডে রচিত 'বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র', 'বৌদ্ধধর্মের মূল ধারণা' 'বৌদ্ধ নির্বাণের ধারণা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া মৈত্রেয় রচিত 'মধ্যান্তবিভঙ্গের অনুবাদ ও টীকা প্রণয়ন, ধর্মকীর্তির 'সন্তানন্তারসিদ্ধির' অনুবাদ ও টীকা শেরবাটস্কির বৃহৎ কীর্তিরূপে বিবেচিত। বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষের তিব্বতী অনুবাদের তিনি অনুবাদ করেছিলেন। এগুলি ছাড়াও ভারতীয় সভ্যতার নানান

দিক নিয়ে তাঁর রচনা আছে। দিগনাগের রচনাবলী উদ্ধার করার কৃতিত্বও বহুলাংশে শেরবাটস্কিব। লক্ষ্যণীয় যে ভারতীয় দর্শনের ন্যায়শাস্ত্রের দিকেই শেরবাটস্কির আগ্রহ বেশি ছিল। অধিকাংশ পশ্চিমী ভারততত্ত্ববিদ যেখানে ভারতীয় দর্শনকে অতীন্দ্রিয়বাদী, অধ্যাত্মবাদী, ইত্যাদি কয়েকটি সহজ ও অসার বিশেষণের দ্বারা ভূষিত করারই প্রয়াস পেয়েছিলেন, সেখানে শেরবাটস্কি ভারতীয দর্শনের যুক্তিশীল ভূমিকাটিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন।

শেরবাটস্কি তাঁব জীবনকালেই একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। আধুনিক সোভিয়েট ভারততত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছাত্র। বর্তমান লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালযের সংস্কৃতের অধ্যাপক ভি. আই. কালিয়োনোভ শেরবাটস্কির প্রত্যক্ষ ছাত্র। শেরবাটস্কির অপরাপর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার অটো রোজেনবুর্গের নাম, যিনি শেরবাটস্কির জীবন কালেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মারা গিয়েছিলেন। চৈনিক ও জাপানী উপাদান সমূহের উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধধর্মের উপর তিনি মূল্যবান কাজ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'বৌদ্ধ দর্শনের সমস্যাসমূহ' শেরবাটস্কি কর্তৃক বিশেষ প্রশংসিত হযেছিল। শেরবাটস্কির অপরাপর ছাত্র-দের মধ্যে বি. ভ্‌লাদিমিরস্তোভ মঙ্গোলীয ভাষা ও সংস্কৃতির উপব ব্যাপক গবেষণা করেছিলেন, পি ভি. এরনস্টেডট কপটিক এবং ধ্রুপদী ভাষাসমূহের উপর কাজ করেছিলেন, এ. ফ্রীমান ইন্দো-ইরা-নীয় ভাষাতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন। শেরবাটস্কির আবও দুজন ছাত্র, যাঁরা অকালে অতি অল্পবযসে মারা গিযেছিলেন, অথচ ভারত-তত্ত্বের ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান অপরিসীম, তাঁরা হচ্ছেন ই. ওবার-মিলার (১৯০১-১৯৩৫) এবং এ. ভস্ত্রিকোভ (১৯০৪-১৯৩৭)।

অল্পবয়সেই ওবারমিলার সংস্কৃত, তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় ভাষা-

সমূহে যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, এবং এ ছাড়া তিনি বৌদ্ধ পুঁথির সন্ধানে মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ধর্মকীর্তির 'ন্যায়বিন্দু' এবং ধর্মোত্তরের 'ন্যায়বিন্দুটীকার' তিনি একটি সংস্কৃত তিব্বতী বিষয়ানুগ নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেন, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭-২৮ সালে। মৈত্রেয় বিরচিত 'অভিসময়ালংকার প্রজ্ঞাপারমতা উপদেশশাস্ত্র' সম্পাদনা অনুবাদ ও ব্যাখার কাজে তিনি শেরবাটস্কির সহযোগী ছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি বিখ্যাত তিব্বতী পণ্ডিত ও ধর্মসংস্কারক শোন-খা-পার উপর একটি গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিব্বতী চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর তাঁর একটি গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। কিন্তু ওবারমিলারেব সবচেয়ে বড় কাজ বু-তোন বিরচিত 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস'-এর ইংরাজী অনুবাদ, এবং একাজে তিনি যে পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন তা তুলনারহিত। শেরবাটস্কির অপর শিষ্য ভস্ত্রিকোভ যিনি ধর্ম-কীর্তিব প্রমাণবার্তিকের উপর যে গবেষণা করেছিলেন তাব গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি ওই গ্রন্থের তিব্বতী সংস্করণের সম্পাদনা এবং তৎসহ দেবেন্দ্রবুদ্ধির টীকার অনুবাদও করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে তাঁর রচিত 'উদ্দোতকরের ন্যায বার্তিক' এবং 'ধর্মকীর্তির বাদন্যায়' প্রকাশিত হয়। তাঁব অপরাপর রচনাব মধ্যে 'বসুবন্ধুব ন্যায়শাস্ত্র' শেরবাটস্কি কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হযেছিল। তাঁর অসমাপ্ত গ্রন্থ 'তিব্বতী ভাষার ব্যাকবণ' তাঁব অকালমৃত্যুব পর শেরবাটস্কি সম্পূর্ণ করেন। ভস্ত্রিকোভের সবচেযে বড অবদান 'তিব্বতী ঐতিহাসিক সাহিত্য' যা তাঁর মৃত্যুর পাঁচিশ বছর পরে বিবলিওথেকা বুদ্ধিকা সিরিজে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে। এ ছাড়া ভস্ত্রিকোভ 'কালচক্র' নামক তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একটি পুঁথির সম্পাদনা করেছিলেন। ওলডেনবুর্গ, শেরবাটস্কি, ওবারমিলার ও সেমিচোভের

সঙ্গে একযোগে তিনি কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রের অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সোভিয়েট যুগে ওলডেনবুর্গ ও শেরবাটস্কি সত্যই ভারত তত্ত্বের একটি বৃহৎ কর্মকাণ্ডে হাত দিয়েছিলেন এবং এই কাজে তাঁরা ভি. ভি. বারতোলদ, আই. উ. ক্রাচকোভস্কি, এন. আই. কন্‌রাড প্রভৃতির সহায়তা পেয়েছিলেন। এঁরা ছাড়াও পূর্ববর্তী যুগের আরও অনেক পণ্ডিত ভারততত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন, যাঁদের মধ্যে কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. কনার্ডয়ের, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি. পি. মিলার, কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি. এ. বোগোরোদিস্কি. খারকোভ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. জি. রিট্রের, ওডেসা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ. আই. টমসন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিয়েভ্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাধিপ্রাপ্ত ভারততত্ত্ববিদদের মধ্যে এ. পি. বারানিকোভ (১৮৯০-১৯৫২), বি. এ. লারিন এবং জি. এস. আল-বুদিয়ানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কনার্ডয়ের 'মানবগৃহ্য-সূত্রের' সঠিক অনুবাদ প্রণয়ন করেছিলেন। অধ্যাপক পি. জি. রিট্রের সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন ওরসাইয়ানিস্কো-কুলিকোভস্কির নিকট, রুশ ভাষায় তিনিই প্রথম কালিদাসের কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মেঘদূতের রুশ অনুবাদ প্রকাশ করেন। দণ্ডীর দশকুমার চরিত্রের রিট্রের-কৃত অনুবাদ সোভিয়েট যুগে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া ভারততত্ত্বের নানা বিষয়ে তাঁর খণ্ড খণ্ড গবেষণা আছে। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে আরও একজন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, যাঁর নাম এ. এস. ষ্টায়েল-হলস্টাইন যিনি সংস্কৃত, চৈনিক ও তিব্বতীয় রচনাবলীর উপর ভিত্তি করে গবেষণা কার্য চালিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি মধ্য এশীয় লিপিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, এবং তোখারীয়

ভাষার উপর মূল্যবান কাজ করেছিলেন। তিনি পেট্রোগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৩-০৪ সালে তিনি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণও করেছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যবান বহু সম্পদের অনুবাদ রুশ ভাষায় করা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে আই, এস, কোসোভিচ-কৃত (ইনি বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ কে. কোসোভিচের ভ্রাতা) নলদময়ন্তী আখ্যানের অনুবাদ (১৮৫১, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬২), আলেকসিস পুতিয়াত-কৃত শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ (১৮৭৯), সের্গেই ওলডেনবুর্গ-কৃত বৌদ্ধ কাহিনীসমূহ (১৮৯৪), এস. ডি. এলমানোভিচ-কৃত মনুস্মৃতির অনুবাদ (১৯১৩), অধ্যাপক এম. ওরলোভ-কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ (১৯১১-১৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কে. ডি. বালমণ্ট-কৃত কালিদাসের 'শকুন্তলা', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ও 'বিক্রমোর্বশী'-র ছন্দোবদ্ধ রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। অবশ্য এগুলি মূল থেকে করা নয়, ফরাসী অনুবাদ থেকে করা। বালমণ্ট অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতের'ও একটি রুশ অনুবাদ করেছিলেন। বিবলিওথেকা বুদ্ধিকা সিরিজের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৯৩৬-এ ওই সিরিজের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার পর ১৯৬০ থেকে তা আবার প্রকাশিত হতে শুরু করে প্রখ্যাত বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ওয়াই এন. রেরিখের (১৯০২-১৯৬০) প্রচেষ্টায়। এ ছাড়া অপরাপর প্রখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ভারততত্ত্ব সংক্রান্ত রচনাবলীর রুশ অনুবাদেরও ব্যবস্থা হয়েছিল 'প্রাচ্য গ্রন্থাগার' নামক একটি সিরিজের মারফৎ। এই সিরিজে বার্থের 'ভারতের ধর্মসমূহ', হারমান ওল্‌ডেনবার্গের 'বুদ্ধ', ম্যাকসমূলারের 'ভারতীয় ষড়্‌দর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থের রুশ অনুবাদ ছাড়াও ফৌসবল অনুদিত 'সুত্তনিপাত', রিজ ডেভিডসের 'বৌদ্ধ সূত্রসমূহ' ও গার্বের 'সাংখ্য দর্শনের' রুশ অনুবাদ

করা হয়, অনুবাদক ছিলেন এন. আই. হেরাসিমোভ। পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের রুশ অনুবাদ একটি যৌথ প্রচেষ্টা মারফৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন পরিবেশের মধ্যেই করা হয়েছিল, এবং এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে বৈদেশিক প্রচেষ্টায় পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের অনুবাদ এই প্রথম। ভারতের ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের উপর বহু গ্রন্থ রুশভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রাগোজিন কৃত 'বৈদিক যুগের ইতিহাস' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত সোফিক এগরোভ রচিত 'ভারতের ইতিহাস'ও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই ধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

সোভিয়েট দেশে ভারততত্ত্বের চর্চা আজও পুরোদমে চলছে। সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করছেন শেরবাটস্কির প্রবীনতম ছাত্র ভি. ই. কালিয়ানোভ। সোভিয়েট মধ্য এশিয়ায় বিস্তৃত খনন কার্যের ফলে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বহু ধ্বংসাবশেষ ও পুঁথিপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, ভারতীয় কুষাণ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পরিচয়ও এই সূত্রে পাওয়া গেছে। বনগার্ড-লেভিন, ভোলকোভা, অ্যালায়েভ প্রমুখ তরুণ পণ্ডিতরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ভারততত্ত্ব চর্চা করে চলেছেন, এবং তাঁদের গবেষণার ফলাফল সমূহও প্রকাশিত হচ্ছে। এন. পি. আনিকীভের মত পণ্ডিতেরা ভারতীয় দর্শনের মূল্যায়ন করছেন নূতন যুগের দৃষ্টি-কোণে। রুশ ভারততত্ত্ববিদদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের কাজ কর্মের বেশ কিছুটা করেছিলেন ইংরাজী ভাষায়, এবং তাঁদের রচনাবলী দীর্ঘকাল ধরেই এদেশের ভারততত্ত্ববিদদের নিকট পরিচিত ছিল, কিন্তু তাঁদের রুশ রচনাবলীর সঙ্গে এখানকার ভারততত্ত্ববিদদের পরিচয় নেই বললেই চলে। সুখের বিষয়, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীন কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট নামক সংস্থা রুশ ভারততত্ত্ব-

বিদগণ প্রণীত রুশ গ্রন্থ সমূহের ইংরাজী অনুবাদ ও সেগুলির প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন, এবং এই সংস্থার সোভিয়েট ইন্দোলজিকাল সিরিজ এ পর্যন্ত পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, এবং আরও যে করবে তা নিঃসন্দেহে আশা করা যায়।

॥ নির্দেশিকা ॥